জাতীয় স্তরের আলোচনা চক্র

বিষয়

বঙ্গে গান্ধী-চর্চা

২ রা সেপ্টেম্বর, ২০১৯ সোমবার
(সকাল-১০.০০ — বিকাল-৫.০০)

আলোচনাচক্রের কার্যবিবরণী

আয়োজক
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
এবং
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
সবং সজনীকান্ত মহাবিদ্যালয়

সহযোগিতায়
ভগবতী দেবী প্রাইমারী টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট
খাকুড়দা, পশ্চিম মেদিনীপুর

স্থান
অডিটোরিয়াম হল
সবং সজনীকান্ত মহাবিদ্যালয়
লুটুনিয়া, সবং, পশ্চিম মেদিনীপুর

জাতীয় স্তরের আলোচনা চক্র

বিষয় - বঙ্গে গান্ধী-চর্চা

২ রা সেপ্টেম্বর, ২০১৯ সোমবার
(সকাল-১০.০০ — বিকাল-৫.০০)

আলোচনাচক্র উপস্থাপন সমিতি

অধ্যাপক (ড.) তপন কুমার দত্ত
সভাপতি, আলোচনাচক্র উপস্থাপন সমিতি
এবং
অধ্যক্ষ, সবং সজনীকান্ত মহাবিদ্যালয়

ড. সিদ্ধার্থশঙ্কর মিশ্র
সহ-সভাপতি, আলোচনাচক্র উপস্থাপন সমিতি
এবং
অধ্যক্ষ, ভগবতী দেবী প্রাইমারী টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট

ড. অনন্যা ঘোষ
সম্পাদক, আলোচনাচক্র উপস্থাপন সমিতি
এবং
বিভাগীয় প্রধান, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

অধ্যাপিকা সুনীতা মিত্র
যুগ্ম-সম্পাদক, আলোচনাচক্র উপস্থাপন সমিতি
এবং
বিভাগীয় প্রধান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ড. সেলিম চিস্তি
আহ্বায়ক, আই. কিউ. এ. সি.
সবং সজনীকান্ত মহাবিদ্যালয়

ড. নির্মল বেরা
সদস্য, আলোচনাচক্র উপস্থাপন সমিতি

অধ্যাপিকা পাপিয়া মাণ্ডী
সদস্যা, আলোচনাচক্র উপস্থাপন সমিতি

ড. রাজেশ কুমার দত্ত
সদস্য, আলোচনাচক্র উপস্থাপন সমিতি

ড. চঞ্চল কুমার মণ্ডল
সদস্য, আলোচনাচক্র উপস্থাপন সমিতি

অধ্যাপক কাশীনাথ বসু
সদস্য, আলোচনাচক্র উপস্থাপন সমিতি

অধ্যাপক তারাপদ মাইতি
সদস্য, আলোচনাচক্র উপস্থাপন সমিতি

ড. অনিমা রায়
সদস্যা, আলোচনাচক্র উপস্থাপন সমিতি

অধ্যাপিকা দেবশ্রী দে ঘোড়াই
সদস্যা, আলোচনাচক্র উপস্থাপন সমিতি

অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ধাড়া
সদস্য, আলোচনাচক্র উপস্থাপন সমিতি

অধ্যাপক লিল্ু মন্ডল
সদস্য, আলোচনাচক্র উপস্থাপন সমিতি

সভাপতির কলমে

ভারতবাসী হিসাবে আমরা গর্বিত যে গত শতকের দু-জন শ্রেষ্ঠ মানুষের মধ্যে একজন হলেন আমাদের জাতীয় জনক মহাত্মা গান্ধী। সত্যসন্ধানী গান্ধীজির জীবনাচরণই সারা বিশ্বের আধুনিক কালের সর্বাত্মক চর্চার বিষয়। হিংসায় প্রমত্ত দুনিয়ায় গান্ধী প্রদর্শিত মানবমুক্তির পথই ক্রমশ গৃহীত হচ্ছে সকলপ্রকার সমস্যার সমাধানের অনস্বীকার্য উপায় রূপে। দীর্ঘকাল পরে আমাদের ভাবতে অবাক লাগবে এমন এক জীবনচর্যার মানুষ এই পৃথিবীর ধূলিমাটির উপর দিয়ে হেঁটে বেড়িয়েছেন। নতুন প্রজন্মের কোমল সবুজ মনের মধ্যে গান্ধীর দর্শন সম্পৃক্ত হলেই আগামী পৃথিবী কলুষমুক্তির পথ পাবে।

অবিভক্ত মেদিনীপুরের প্রায় অর্ধশতাব্দী প্রাচীন সবং সজনীকান্ত মহাবিদ্যালয় 'সবঙ্গ' নামক প্রাচীন জনপদটিতে শিক্ষার আলোকবর্তিকা জ্বেলে রেখেছে। দেশীয় মুক্তি আন্দোলন থেকে সমাজ চেতনার নানা প্রান্তে এতদ্‌ঞ্চলের অবদান ইতিহাস শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। সেই ধারা পথে মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের যৌথ উদ্যোগে এবং ভগবতীদেবী প্রাইমারী টিচার্স ট্রেনিং ইনসি টিউটের সহযোগিতায় 'বঙ্গে গান্ধী-চর্চা' শীর্ষক জাতীয় স্তরের আলোচনা চক্রটি একটি অনবদ্য ও সমৃদ্ধিময় সংযোজনা।

এই আলোচনা সভায় ভারতখ্যাত চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম সংযুক্ত হয়েছে। খ্যাতকীর্তি অধ্যাপকগণ আমাদের প্রতিষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁদেরকে স্বাগত ও একই সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এই প্রয়াসে সংশ্লিষ্ট সকলকে সাধুবাদ জানাই।

অধ্যাপক (ড.) তপন কুমার দত্ত
সভাপতি, আলোচনাচক্র উপস্থাপন সমিতি
এবং
অধ্যক্ষ, সবং সজনীকান্ত মহাবিদ্যালয়

সম্পাদকের কলমে

আন্তর্জাতিক বিশ্বে যে ভারতীয় নামটি সবচেয়ে বিখ্যাত ও আলোচিত, তা হল – মহাত্মাগান্ধী। মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও আদর্শ সারা বিশ্বে বহুমানুষের অনুধ্যানের বিষয়। মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষে একদিকে যেমন ঋষিকেশ মানুষ হিসাবে পূজিত, অন্যদিকে তেমনি গান্ধীচর্চার ক্ষেত্রে এক সীমাহীন বিদূষণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে ইদানিং কালে। Social Media-তে আমরা প্রায়শই দেখি এই জাতীয় বিদূষণের প্রাবল্য আমাদের বাংলাতেও কম নয়।

বাংলার গান্ধী বিরোধিতার একটি বৌদ্ধিক ঘরানা আছে। এই বিরোধিতার সুরটি মূলত মহাত্মা গান্ধীর নীতি এবং আদর্শ সম্পর্কিত। বলা বাহুল্য, সেখানে ব্যক্তি মহাত্মাগান্ধীর ভাবমূর্তির প্রতি নগ্ন আক্রমণ নেই। মার্কসবাদী বাঙালী চিন্তাবিদেরা একভাবে গান্ধীর সমালোচনা করেছেন, আবার সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি অনুরক্ত বাঙালী আরেকভাবে গান্ধী সমালোচনায় মুখর হয়েছেন। এই শেষোক্ত সমালোচকেরাই বাঙালী সমাজে সংখ্যা গরিষ্ঠ। ১৯৩৮-৩৯ খ্রিঃ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মহাত্মা গান্ধী ও সুভাষচন্দ্র বসুর মধ্যে যে বিরোধিতার সৃষ্টি হয়েছিল তার সূত্র ধরে বাঙালী সুভাষ প্রেমীরা গান্ধীজির একরৈখিক সমালোচনা করে এসেছেন। যদিও একথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, সুভাষচন্দ্র ও গান্ধীর পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল চিরদিন অমলিন ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ। সুভাষচন্দ্রই তাঁর বেতার সম্ভাষণে প্রথম মহাত্মাগান্ধীকে সম্বোধন করেছিলেন 'Father of the Nation' বলে। অন্যদিকে গান্ধীজির চোখে সুভাষচন্দ্র ছিলেন 'Patriot of all patriot'

বৌদ্ধিকভাবে গান্ধী বিরোধিতার মধ্যে গান্ধী ভক্তি নেই। তেমনি গান্ধী বিদ্বেষের অযুক্তি পূর্ণ অপসংস্কৃতিও সেখানে নেই। ভাবলে অবাক লাগে বর্তমান বাংলায় এমনকি গান্ধীবিরোধী পুস্তক জনপ্রিয় সেগুলি তথ্যযুক্তি পরিহার করে নগ্নভাবে গান্ধী আক্রমণের দৃষ্টান্ত।

বর্তমান বাংলায় এমন মানুষের সংখ্যা কমে যাচ্ছে যাঁদের আমরা গান্ধীবাদী বলে চিহ্নিত করতে পারি। গান্ধীবাদে উদ্বুদ্ধ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত সাহিত্যিক, অমলেশ ত্রিপাঠীর মত ঐতিহাসিক কিংবা অম্লান দত্তের মত অর্থনীতিবিদ এযুগে প্রায় দুর্লভ। এক সময় মেদিনীপুর-পুরুলিয়ার মত জেলাগুলিতে রাজনীতির পরিসরে গান্ধীবাদ বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক ছিল। পুরুলিয়া জেলায় লোক সেবক সংঘ নামের সংগঠনটি একান্তভাবে একটি গান্ধীবাদী রাজনৈতিক সংগঠন ছিল। পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তি আন্দোলনটি ছিল বিশুদ্ধভাবে গান্ধীপন্থী। গান্ধীর শতবর্ষেও বাংলায় গান্ধীবাদের যে প্রাসঙ্গিকতা ছিল সার্ধশতবর্ষে তার ভগ্নাংশও নেই, একথা বলা যেতেই পারে।

গান্ধীজির জীবন, আদর্শ এবং বাংলায় তাঁর চর্চার বিভিন্ন মাত্রা নিয়ে 'বঙ্গে গান্ধী-চর্চা' শিরোনামে সবং সজনীকান্ত মহাবিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের পক্ষ থেকে ভগবতীদেবী প্রাইমারী টিচার্স ট্রেনিং ইনসি টিউটের সহযোগিতায় যে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে, তা সার্ধশতবর্ষে জাতির জনকের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য। আমরা আশা রাখি বিভিন্ন বক্তার বক্তব্যে এবং বিভিন্ন গবেষণাপত্র পাঠের মধ্য দিয়ে গান্ধীচর্চা নতুন উদ্দীপনা পাবে। আমরা জানি আমাদের প্রয়াস সীমিত, কিন্তু আমরা বিশ্বাস রাখি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমনতর বহু সমীহ প্রয়াসের মধ্য দিয়ে আমরা সমবেত ভাবে সার্থক হব বাংলার গান্ধীচর্চার ধারাটিকে বেগবান করতে।

ড. অনন্য ঘোষ
বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ
এবং
সম্পাদক, আলোচনাচক্র উপস্থাপন সমিতি

মূল্যবোধ ও মানবিকতায় গান্ধীজি

চারিদিকে হিংসা, বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা পরায়ণতার খেলা চলছে। যুদ্ধের বদলে যুদ্ধ, হিংসার পথে কখনও শান্তিকে আনা যায় না। বর্তমানে এই বাতাবরণে তাই গান্ধী চর্চা প্রাসঙ্গিকতা ততখানি, যতখানি প্রাসঙ্গিক বিশুদ্ধ বাতাস সুস্থ জীবন ধারণের জন্য। একা পথ চলা অন্তহীন নিঃসঙ্গতা, একতা, যুথ বদ্ধতা প্রতিকূলতা জয়ের সুনিশ্চিত হাতিয়ার। তাই আজ আমরা ভাবনায় প্রাণিত গোটা বিশ্ব। আর তাই আমাদের এই যুগ্ম পথ চলা শুধু আজকে নয়, আগামীতেও সুনিশ্চিত করতে হবে। যুগে যুগে কিছু মানুষ আলোক মশাল নিয়ে আসেন, নতুন করে মানুষকে ভাবতে শেখান। মানুষকে স্বাধীনতার স্বাদ নিতে শেখান। এমন একজন মানুষ কিংবদন্তী মহাত্মা গান্ধী, যিনি তার জীবনের সবটুকু দিয়ে মানব কল্যাণের বাণী রচনা করেছেন। তাই সার্ধ শতবর্শে 'বঙ্গে গান্ধী -চর্চা' প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

ভবিষ্যতের পথে অস্তিত্ব কিংবা জয়কে সুনিশ্চিত ও মহিমান্বিত করে তুলতে হলে অতীতকে জানা অনস্বীকার্য। অতীতের হাত ধরে বর্তমানকে গ্রহণ করে আগামীতে উত্তরণের চেষ্টাই সুস্থ সংস্কৃতি মনস্ক মানুষের কাজ। জাতীয় ঐতিহ্য, জাতির প্রতি শ্রদ্ধা, ঐতিহ্যের সংরক্ষণ খুবই প্রাসঙ্গিক আজকের দিনে। যে জাতি নিজেকে সম্মান করতে শেখেনি সে অন্যের কাছ থেকে সম্মানও পাইনি। তাই প্রয়োজন শ্রদ্ধাশীল সংস্কৃতি মনস্ক সমাজ গঠন। সামুদায়িক ভাবনায় মহিমান্বিত হোক আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ।

গান্ধীজি ছিলেন অহিংসার পূজারী। তাই বিশ্বের যে কোনো প্রান্তেই তাঁর স্বশ্রদ্ধ অবাধ পদচারণা। এরই ফলশ্রুতি হল বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ। আসুন 'বঙ্গে গান্ধী-চর্চা'য় আমরা সেই বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধের উৎস উন্মোচন করি। আমাদের এই যৌথ প্রয়াস মহৎ উদ্দেশ্যের হাতিয়ার হোক। শিক্ষামূলক ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচিতে আমরা সম্মিলিতভাবে এগিয়ে চলব –এই প্রত্যাশা রাখি।

ড. সিদ্ধার্থশঙ্কর মিশ্র
সহ-সভাপতি, আলোচনাচক্র উপস্থাপন সমিতি
এবং
অধ্যক্ষ, ভগবতী দেবী প্রাইমারী টিচার্স ট্রেনিং ইনসি টিউট

অনুষ্ঠান সূচি

২ রা সেপ্টেম্বর, ২০১৯ সোমবার
(সকাল-১০.০০ — বিকাল-৫.০০)

নিবন্ধীকরণ

সকাল-১০.০০ — ১০.৩০

উদ্বোধনী পর্ব

সকাল-১০.৩০ — ১১.০০

উদ্বোধন	ঃ	প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, অতিথি অভ্যর্থনা
স্বাগত ভাষণ	ঃ	**অধ্যাপক (ড.) তপন কুমার দত্ত** সভাপতি, আলোচনাচক্র উপস্থাপন সমিতি এবং অধ্যক্ষ, সবং সজনীকান্ত মহাবিদ্যালয়
সম্পাদকীয় প্রসঙ্গে	ঃ	**ড. অনন্যা ঘোষ** সম্পাদক, আলোচনাচক্র উপস্থাপন সমিতি এবং বিভাগীয় প্রধান, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ধন্যবাদ জ্ঞাপন	ঃ	**ড. সিদ্ধার্থশঙ্কর মিশ্র** সহ-সভাপতি, আলোচনাচক্র উপস্থাপন সমিতি এবং অধ্যক্ষ, ভগবতী দেবী প্রাইমারী টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট

প্রথম অধিবেশন

সকাল-১১.০০ — দুপুর-১.০০

সূচক বক্তা ও সভাপতি	ঃ	**ড. গোপালচন্দ্র মিশ্র** অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাক্তন উপাচার্য, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
বক্তা	ঃ	**ড. শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী** অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
বিষয়	ঃ	**গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ**

বক্তা ঃ **ড. শ্রাবণী পাল**
অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
বিষয় ঃ **বাংলা কথা সাহিত্যে গান্ধী প্রসঙ্গ ঃ সতীনাথ ভাদুড়ী**
বক্তা ঃ **ড. বাণীরঞ্জন দে**
বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
বিষয় ঃ **তারাশঙ্করের সাহিত্যে গান্ধীবাদ**

মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতি
দুপুর-১.০০ — ১.৪৫

দ্বিতীয় অধিবেশন

দুপুর-১.৪৫ — বিকাল-৩.০০

সভাপতি ঃ **ড. শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী**
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
বক্তা ঃ **ড. তপন কুমার খাঁড়া**
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কোলহান বিশ্ববিদ্যালয়
বিষয় ঃ **আধুনিক ভারত গঠনে গান্ধীজির সর্বোদয় আন্দোলনের ভূমিকা**
ড. শিবাজী প্রতিম বসু
অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
বিষয় ঃ **গান্ধীজির জাতীয়তাবাদ অথবা আত্মনিয়ন্ত্রণের শৃঙ্খলা**

তৃতীয় অধিবেশন

বিকাল-৩.০০-৪.৩০

গবেষণা পত্রপাঠ

সভাপতি ঃ **ড. অনন্যা ঘোষ**
বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ
সবং সজনীকান্ত মহাবিদ্যালয়

সমাপ্তি অধিবেশন

বিকাল-৪.৩০-৫.০০

সভাপতির অভিভাষণ ঃ **অধ্যাপক (ড.) তপন কুমার দত্ত**
সভাপতি, আলোচনাচক্র উপস্থাপন সমিতি
এবং
অধ্যক্ষ, সবং সজনীকান্ত মহাবিদ্যালয়
ধন্যবাদ জ্ঞাপন ঃ **অধ্যাপিকা সুনীতা মিত্র**
যুগ্ম-সম্পাদক, আলোচনাচক্র উপস্থাপন সমিতি
এবং
বিভাগীয় প্রধান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

শংসাপত্র প্রদান

গান্ধী-স্মরণ

অধ্যাপক অরুণোদয় বসু
অধ্যাপক, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ
সবং সজনীকান্ত মহাবিদ্যালয়

কেটে যায় কত দীন-হীন ক্ষণ,
কাঁদে ভারতের মাটি-আকাশ;
একবার যাহা হারিয়ে যায় –
মেলেনা তো আর কোনো আভাস।
কে' বা আজ বোঝে, কে'বা খোঁজে আজ,
তুমি সন্ন্যাসী, তুমি ত্যাগীরাজ;
ফিরো এসে পুনঃ তোমার মন্ত্র
শিখাও মোদের ''মোহন দাস''।
অন্ধকারে একলা পথে চলব,
নিজের মনেই, নিজের কথা বলব,
জ্বলুক আগুন, ভাসুক ভুবন,
আসুক নাকো ভীষণ রাহুর পূর্ণগ্রাস
সঙ্গে জানি থাকবে তুমি মোহন দাস।

গান্ধীজী : রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে একজন শিখণ্ডী

ড. অমিত দে
সহকারি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
কাশীপুর মাইকেল মধুসূদন মহাবিদ্যালয়

আপোষহীন সত্যের প্রতীক এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব অবশেষে মহাভারতের শিখণ্ডীর মতো ভারতের রাজনীতিতে ব্যবহৃত এক ব্যক্তিত্ব হলেন গান্ধীজী। তিনি এমন সময় ভারতের রাজনীতিতে এসেছিলেন যখন ভারতবর্ষের হৃদয়ের অন্তস্থলে গভীরভাবে প্রথিত হয়েছে সেই কালরোগ যা ভারতের অন্তস্থলকে কুরে কুরে খেয়েছে। সেই যাকে যক্ষা রোগ বলে তা ভারতবর্ষের মেরুদন্ডকে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল। এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল সমাজে যাতে হাতুড়ে চিকিৎসা ফলবতী ছিল না, দরকার ছিল একজন শল্য চিকিৎসকের যে নাকি রাজনৈতিক মেরুদণ্ডহীনতাকে তাঁর হাতের পরশ দিয়ে জনমুখী আন্দোলনে রূপায়িত করতে পারে। এই পরিস্থিতিতে গান্ধীজী সেই ধাত্রীবীর তথা চিকিৎসকের ভূমিকা গ্রহণ করে মুক্তি আন্দোলনের স্পৃহাকে জন আন্দোলনের রূপ দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এই ক্যারিশ্মাটিক চরিত্রকে 'আপনি চার আনার মেম্বার নন' – এই শক্তিশেলটি সহ্য করতে হয়েছে। পারিবারিক জীবনে বিধ্বস্ত, পরবর্তীকালে রাজনৈতিক ময়দানে দ্বিধাগ্রস্ত এই ব্যক্তিত্বটিকে ব্যবহার করা হয়েছে রাজনৈতিক দলের লোগো হিসাবে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে নির্লোভ ব্যক্তিটিকে নোটে ছাপিয়ে নাকি তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করা হচ্ছে ? পরবর্তীকালে দিনবদলে, পটবদলে এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনের ধারাপথে গান্ধী রাজনৈতিক দলের সম্পত্তি হয়ে গেছেন। আপোষহীন ব্যক্তিত্ব মৃত্যুর পরে ক্রমে ক্রমে ক্ষমতাসীনদের হাতে শিখণ্ডীতে পরিণত হয়েছে। বঙ্গের মানুষ এবং বঙ্গভাষী হিসাবে এই আক্ষেপ আমাদের যাবার নয়। বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে গান্ধীজীর পদস্পর্শ এবং করস্পর্শ লেগে রয়েছে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে চরকার প্রদর্শন এবং রামধুন সঙ্গীত ছাড়া গান্ধীর অনুভবের স্পর্শ আমরা কী পাই? প্রশ্ন হল এরকম ভাবে ভাবছি কেন? তাহলে পুরানো একটি কথা মনে করিয়ে দেওয়া যাক, মহামতী গোখলে বলেছিলেন একদিন 'what bengal's think today India thinks tomorrow' তারপর থেকে তো প্রচার মাধ্যমের অপপ্রচারে তলানিতে ঠেকেছে তাই আমরা এই তলানি থেকেই নতুনভাবে এই ভাবনাটি করছি যে, গান্ধীকে আবার নতুনভাবে ভাবা হোক। গান্ধীকে নিয়ে প্রদর্শনী এবং ব্যবসা বন্ধ হোক। গান্ধীকে স্মরণ করে আজকে আমরা শপথ নিই আপোষহীন সত্যের প্রতীক হয়ে আমরা বঙ্গ থেকে আবার এক স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু করি যা ভারতকে এক নতুন আন্দোলনের দিশা দেখাবে। যতই আমরা স্বদেশ স্বদেশ বলি না কেন নিও ইকোনমিক সিস্টেমে এই দেশটা আমাদের নয় – 'স্বদেশ স্বদেশ করি মোরা এদেশ মোদের নয়'। এখান থেকেই শুরু হোক নতুন করে জয়যাত্রা।

সূচক শব্দ : গান্ধীজী, আপোষহীন সত্য, শিখণ্ডী, বঙ্গভাষী, ব্যবসা।

ENVIRONMENTAL CONSCIOUSNESS IN THE LIGHT OF GANDHI'S PHILOSOPHY

DR. PINKI DAS
ASSISTANT PROFESSOR
DEPARTMENT OF PHILOSOPHY
SABANGSAJANIKANTAMAHAVIDYALAYA
PASCHIMMEDINIPUR

Environmental degradation is burning issue in modern period. Modern human beings bring an extreme form of anthropocentrism, where men are said to be the measures of all things. Present generation realizes that humans are marched towards engendering sphere. Modern men want more and more from nature. The present eco-degradation is the outcome of greed on part of the ridiculous and careless application of technology. Gandhi's contribution to the environmental consciousness is very meaningful. To him, our need will be satisfied if we have less of greed. It is mentioned that simple life is one which requires only bare necessities of life. It is a life of satisfaction, a pleasure. The ancient Greek ideals of life of observation and meditation could be realized through the Gandhian path. There was a fundamental unity in diversity in Gandhi's Philosophy.The Gandhian principles of 'Deep Ecology' can be used for finding solutions for a new eco-friendly world order. It is a holistic approach. 'Self-realization' is the ultimate objective of Deep ecology. Through self-realization oneself can merge with other self and becomes greater self. A greater self is total destruction of the concept 'I' and 'mine'. This is the stage of total destruction of self-centeredness. Gandhi's aim was not only to have political freedom but freedom from poverty, inequality, caster, religion, discontent and fear. The ultimate goal is attainment of Mok?a, i.e. freedom from all ills and merging with the nature as part of it. In a nutshell, Gandhi's philosophy is based on the idea of 'oneness of life'.

Key words:Mother Earth, Deep Ecology, Self-realization,Oeness,Mok?a.

A Study on Mahatma Gandhi in the Light of Physical Education

Dr. SomnathSaha
Assistant Professor
Physical Education
SabangSajanikantaMahavidyalaya

It is extensively considered that Mohandas KaramchandGandhi had no relationship with sports because of any reference of the Mahatmaji take part or publicly supportsport in the pages of history. In spite of that he can't be adhered to anti-sports. It is true thatGandhiji spent mostly his entire past in political and socioeconomic movement. The existence of Physical education and sports in politics, social and economic movement cannot be ignored. At that time people were more emphasis on freedom and rights and sports was never a priority. Mahatmajiis a football fan and loved football very much. Gandhiji was the key member of the group of Indians who helped to found the Transvaal Indian Football Association in 1896, the first organized football group in Africa that was not run by whites. Agriculture is the inherited occupation in West Bengal indeed of the human race. The Father of the Nationcomparing sports with farming, not only for thebody, soul, spirit and mindbut also useful dignified and remunerative. Though there is no evidence cricket link to him. There is a Mahatma Gandhi Cricket Stadium in Salem, Tamil Nadu. The stadium was founded in 1973 and number of first class matches was played till date.Fair play and honesty is being the basic essence of sporting sprit, propagated by allthe International sports authority in the world, a key ofGandhian philosophy. It enhances the linkage of sports to the Father of the Nation in more ways.

Key Words: Socio-economic, politics, sports

Impact of Mahatma Gandhi's Thought on Libraries of Bengal

Mr. Amalendu Santra,
Librarian
Sabang SajaniKanta Mahavidyalaya

A library is an indication of education. Being a people university, it is necessary for every nation.Mohundas KaramChand Gandhi realized that education is an only way to develop the country. He rightly visualized the importance of providing education, both formal and informal self-education, through the provision of a library service, to one and all, especially to the poor. According to Gandhi, a library hall is always well warmed and ventilated than a luxuriously fitted room. He also felt that library is the cheapest place where unprivileged and poor people of the community can gain knowledge.

Mr. Gandhi referred on his speech in Durban city that in a big city like Durban where there was a large Indian population, a good library was indeed necessary to meet the demand of the common people of the society. His speech inspired the citizens of Durban to establish a library called Diamond Jubilee Library. Mr. Gandhi also made some valuable suggestions regarding the selections of books and the hours during which the library should be kept open. He exhorted the public to visit the library, particularly on Sundays. His opinion on library service was, no doubt, revolutionary in the year 1933 in India. His conception of library service almost coincided with that of a professional. This professional was none other than Dr. S.R Ranganathan, the World famous library scientist of India. So,the thinking of Mahatma Gandhi must encourage the common people of the rural community to use the public libraries in West Bengal.His view gives more emphasis for the establishment more libraries not only in West Bengal, but all over in India where most of the people are unprivileged, poor and illiterate.

সমাজ সংস্কারক গান্ধী

রুম্পা মণ্ডল
গবেষক

জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের একজন আদর্শ সমাজ সংস্কারক। কেননা ধর্মীয় ভন্ডামী ও অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে তিনি নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মনে করতেন সত্যই ঈশ্বর। একমাত্র আত্মসংযম ও সত্যবাদী মানুষ ঈশ্বরকে অনুভব করতে পারেন। গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন প্রতিটি ধর্মের মূলে আছে অহিংসা। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে তাঁর জন্মগ্রহন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি একজন শুদ্ধ মানবাত্মা। ইংরেজদের মসলিন পোশাক বর্জন ও ভারতীয় চরকায় বোনা পোশাক পরিধান করতেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব দেবার সময় তিনি উপলব্ধি করেন– ভারতবর্ষের মানুষজনকে বর্ণ ও জাতিগত বৈষম্য, নারীর পরাধীনতা। এছাড়াও ভারতবর্ষের বেশিরভাগ মানুষজন অর্থনৈতিক দিক থেকে সচ্ছল নয়। একটা জাতি বা দেশের উন্নতিকল্পে এই সকল বৈষম্য দূরীভূত করতে হবে। আবার পরাধীন ভারতবর্ষে বিদেশী শাসন ও শোষন থেকে মুক্তির কামনায় স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সমাজের উন্নতিকল্পে ভারতীয় মানুষজনের কিছু কিছু খাদ্যাভাসেরও প্রয়োজন। যেমন নিরামিষ খাদ্য ভোজন, মদ্যপান বর্জন ও নারীসঙ্গ থেকে বিরত থাকা। গান্ধীজী মনে করতেন ভারতীয় মানুষজন নিম্ন আয়ের অধিকারী সে কারনে তারা স্বল্পমূল্যে নিরামিষ আহার ভোজন করতে সক্ষম। গান্ধীজীর এই মত ও পথ ভারতবর্ষের মানুষজনদের উদ্বুদ্ধ করেছে।

গান্ধীজী হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহন করলেও সকল ধর্মকে সমানচোখে দেখতেন। ভারতবর্ষে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, অশিক্ষা ও কুসংস্কার দূর হলেই ভারত স্বাধীন হবে। ভারতবর্ষের মানুষজনের মদ্যপান থেকে বিরত থাকতে হবে। অসাম্প্রদায়িক মনোভাব পোষন করলেই ভারত জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসল লাভ করবে। আধুনিক ভারতে গান্ধীজী নামটি অতি জনপ্রিয় কেননা ২রা অক্টোবর গান্ধীর জন্ম দিনটি জাতীয় ছুটি হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। গান্ধীজীর জন্ম সার্ধশতবর্ষে গান্ধীজীকে নিয়ে সকলেই মাতোয়ারা কেননা গ্রামভিত্তিক মানুষজনকে স্বনির্ভর করে তুলতে গান্ধীজীর অবদান অপরিসীম। ১৯৪৮ সালে ৩০শে জানুয়ারী এই মহান সমাজ কর্মীকে হত্যা করেন নাথুরাম গডসে। একবিংশ শতাব্দীতে সমাজে নারী ও পুরুষের বৈষম্য, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কিছুটা মিটেছে। তৎসত্ত্বেও পুরোপুরি নির্মূল হয়নি কেননা কন্যাভ্রুন হত্যা, ধনী ও দরিদ্রের ভেদাভেদ থেকেই গেছে। তাই বর্তমানকালে গান্ধীজী এত আলোচিত ও প্রশংসনীয়।

মুক্তধারা ও গান্ধী দর্শন

লিল্ু মন্ডল
অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সবং সজনীকান্ত মহাবিদ্যালয়

রবীন্দ্র সাহিত্যের দার্শনিক ভিত্তি তাকে বিশিষ্টতা দান করেছে। বিশেষত রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলিতে রবীন্দ্রনাথের রূপ থেকে অরূপ, সীমা থেকে অসীম, মর্ত্য থেকে অমর্ত্যলোকে যাত্রার কাব্যিক উপলব্ধি কম বেশী ছায়া ফেলেছে। এই পর্বে কবির 'মুক্তধারা' নাটকটির মধ্যে কবির উপলব্ধি গান্ধী দর্শনের সীমানা স্পর্শ করে। ব্যক্তিগভাবে কবিগুরু এবং জাতির জনকের সুমধুর সম্পর্ক গান্ধীজির স্বায়ত্ত শাসনমূলক ও আত্মদর্শনমূলক ভাবনা এবং রবীন্দ্রনাথের মানব প্রেম ভাবনাকে যেন পারস্পরকি পরিপুষ্টি দান করেছে। 'মুক্তধারা' নাটকে মারখানেওয়ালা মানুষের প্রতিবাদের মতই মারনেওয়ালা মানুষের অন্তর থেকে চেতনার জাগরণ দেখতে পাই। যুবরাজ অভিজিৎ সেই জাগ্রত আত্মা। গান্ধীজির অহিংসবাদী দর্শনে তিনি মানবাত্মাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সেখানে যতই হিংস্রতা আসুক না কেন এক সময় তার অন্তরের মানুষটি জাগ্রত হবেই। এই বিশ্বাসবোধ তার দর্শনে আমরা সারাক্ষণই লক্ষ্য করি। রবীন্দ্র সাহিত্যে অপরাপর ক্ষেত্রেও গান্ধী দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। কিন্তু বোধ করি 'মুক্তধারা' নাটকেই তিনি মূল ভাবনাটিকে গান্ধীজির আদর্শ যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

Gandhi's Notion of Power

Dr. Sanchita Sanyal
Dept. of Political Science
Asutosh College

Power resides at the centre of politics. To Gandhi, power is not the end but is means by which people can change his or her surroundings. Gandhi's understanding of power was similar to Shakti which comes from soul or atman. Truth is the ultimate source of power. To him, power was not similar to authority or Khamata .This paper seeks to understand the nature of power which Gandhi wanted to express and its relevance in present time.

Gandhi departed in many ways from the western notion of power. The west had working on the concept of power in theory and in practice from very early days. Western modernity claims that power should have an authority to be enforced and their notion of power primarily comes from various institutional practices. Whereas, Gandhi searched the source of power outside the political institution and the institutional practices as well.

Gandhi can be marked for the awakening of the poorest of the poor through the means of power which he called atmashakti. . His struggle was for justice against the institutional and social unfairness sanctioned by the authority in many ways can be seen as his understanding of power as a whole. Therefore, his notion of power resides at the bottom of the society where the poorest of the poor resides. Power, to him, should not be placed at the realm of politics which evolves around the institutions. Gandhi locates the power within the individual not in the institution. To him, the real power helps an individual to fight against the injustice. Self governance, to Gandhi, is the ultimate source of power.

Prayer, duties, freedom, resistance and autonomy can be seen as the pillars of Gandhi's notion of power. To Gandhi empowerment and self rule was not the same concept. Therefore, Gandhi's understanding of power diametrically differs from the modern notion of power.

In present context, Gandhi is extremely relevant in our country. At this moment, the call for a powerful state or a strong nation are considered as a need for existence. On the contrary, from Gandhi's perspective a powerful soul is the utmost need for our existence. The idea regarding power he holds that the power resides in the soul and it expresses its existence through a sense of social harmony. The current official call for making a strong India, therefore, totally goes against the notion of Mahatma.

Gandhi and His Mode of Resistance: Social Absorption or Unity of Opposite?

Dr. Sumit Adhikary
Department of Bengali
Scottish Church College

This paper would like to enquire into the mode of resistance of Gandhi. His engagement with the task of social assimilation was one of his mode for defy the colonial power. Not exclusion, but inclusion was his way of success. The colonial rulers tried to fragment the Indian society on the basis of caste, class, religion and so on. Gandhi; on the contrary, presented a new formula for struggle against the Raj. Brotherhood and the attachment with the natives beyond its social strata was his first and foremost tool for dismantling the base of the Raj. What was the mode that he applied for bringing unity? The paper try to search Gandhi's way for making the tie among the different sections of the people.

The Raj had experienced mass movements restricted to the elite groups of the society. The trio of ' Lal, Bal and Pal' tried to make Congress something more than just a debating club for the Indian educated elite. Gandhi for the first time could achieve the unity of peasants, workers, businessmen and zamindars alike. His idea of non violence attracted the entrepreneurs as it ensured no harm to their business. The traditional business houses sided with the khadi movement as it offered them a chance to compete with the Manchester firms. Gandhi maintained a distance with the INTUC unlike other leaders of his era. This encouraged the peasants not to feel alienated. His movement against untouchability motivated the lower caste to be sympathetic to the nationalist movement . Gandhi's trying to unite the farmers with the zamindars in the struggle against the Raj was itself a great achievement. The question is, can we call this method as a unity of opposite?

His model of social assimilation against the political tactics of the British for making division, essentially stood on the formula of 'unity of the opposite' propounded by an old Greek philosopher Heraclitus.

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথঃ- প্রেক্ষিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

ড. অম্লান কুমার গুহঠাকুরতা
বিভাগীয় প্রধান;
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,
নহাটা, জে. এন. এম্. এস্. মহাবিদ্যালয়

দিনটা ছিল ১৫ই মার্চ। কলকাতা পৌরসভা ভবনে মহাত্মা গান্ধীর জন্য আয়োজন করা হয়েছিল আরও একটি সম্বর্ধনা সভা। ভারতের এক কিংবদন্তী নেতা রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী (১৮৪৮-১৯২৫) যিনি কিনা দেশবাসীর কাছে 'সারেন্ডার-নট-ব্যানার্জী' বা 'বাংলার মুকুটহীন রাজা' নামেও পরিচিত ছিলেন, তিনি তাঁর ভাষণে এক সুন্দর কথা বলেন। তিনি বলেন ইতিহাসের পাতায় গান্ধীর নাম চিরস্থায়ী হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেটিকে জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে গান্ধীজীর দান বলে বর্ণণা করেছিলেন, সেই বিষয়টির কথা মনে রেখেই রাষ্ট্রগুরুর এহেন উক্তি।প্রখ্যাত কবি রবার্ট ব্রাউনিং একবার লিখেছিলেন- 'জানা এক জিনিস, কিন্তু তা কাজে পরিণত করা আরও এক জিনিস'। কিন্তু এই এক মানুষ যিনি শুধু জানতে চাননি, সত্য শিব সুন্দর এই তিন মুখ্য মানবিক মুল্যবোধের ওপর নির্ভর করে তাঁর জীবন যাপন করেছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই কথা লিখেছিলেন। তিনি লিখেছেন 'যে এই নীতিগুলি সম্বন্ধে কত বলা হয় এমনকি এইগুলি সম্বন্ধে লিখেওছেন তিনি, কিন্তু সত্যি সত্যিই এইগুলিকে ভিত্তি করে কেউ জীবনধারণ বা চালনা করতে পারেন তা একমাত্র গান্ধীজীই দেখিয়েছেন।রবীন্দ্রনাথের মতো গান্ধীবোদ্ধা প্রায় নেই বললেই চলে এবং তা কেবল গান্ধীজীর কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে নয়, তাঁর সুউচ্চ মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন সমগ্র জীবন, দুর্জয় সাহস ও সকলের কল্যানে প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গও কবিকে গভীরভাবে মুগ্ধ ও প্রভাবিত করেছিল এবং বক্তৃতা ও লেখায় নানাভাবে তিনি তা ব্যক্ত করেছেন। আমার বর্তমান নিবন্ধটিতে জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ – এই দুই মহামানবের পারস্পরিক সম্পর্ক সমগ্র মানব সভ্যতার ইতিহাসে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিলো তা আলোচনা করবো।

সূচক শব্দাবলীঃ- মুকুটহীন রাজা, সত্যাগ্রহ, মূল্যবোধ, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন।

বঙ্গীয়সাহিত্যে মহাত্মগান্ধিনঃ প্রভাবঃ

সুমন্ত-চৌধুরী
সহায়কাধ্যাপকঃ, সংস্কৃতবিভাগঃ
সবং সজনীকান্ত-মহাবিদ্যালয়ঃ

ভারতীয়-রাজনৈতিকেতিহাসাকাশে মোহনদাস-করমচাঁদগান্ধী দেদীপ্যমানং নক্ষত্রমিব রাজতে। তস্য জীবৎকাল ঊনসপ্তত্যধিকাষ্টাদশেশবীয়াব্দস্য অক্টোবরমাসস্য দ্বিতীয়দিনাঙ্কতঃ অষ্টচত্বারিংশদধিকোনবিংশতি-তমেশবীয়াব্দস্য জানুয়ারীমাসস্য ত্রিংশদ্দিনাঙ্কং যাবৎ। তস্মিন্ সময়ে ভারতবর্ষম্ আঙ্গলৈঃ পরাধীনম্। আঙ্গলশাসকানাং নানাবিধাপকর্মণাং বিরোধং কুর্বতা লাঞ্ছিতেন পীড়িতেন চ গান্ধিনা অনুভূতং যুক্তিনীতিমানবতাবাদানাং কিঞ্চিদপি মূল্যং নাস্তি আঙ্গলীয়েষু। অস্ত্রবিদ্যাবলীয়সাম্ আঙ্গলীয়ানাং পরাজয়োপায়ত্বেন হিংসামার্গং পরিত্যজ্য অহিংসামার্গঃ অসহযোগমার্গশ্চ তেন আশ্রিতঃ।

গান্ধিমহোদয়স্য রাজনীতৌ প্রবেশাৎ পরমেব ভারতীয়েষু আঙ্গলীয়পরাধীনতায়াঃ মুক্তিলাভায় নবীনা আশা, নবীনশ্চ উদ্যমঃ দৃষ্টঃ। গান্ধিমতাদর্শানুপ্রেরিতানাং তদানীন্তনভারতীয়সাহিত্যিকানাং সাহিত্যকর্মসু প্রতিফলতি তদীয়চিন্তাধারা। বঙ্গে অপি এতস্য ব্যতিক্রমো নাসীৎ। গান্ধিনঃ জীবনং তথা চিন্তাধারাম্ আশ্রিত্য বঙ্গভাষয়া রচিতঃ প্রথমো গ্রন্থো ভবতি যোগেশচন্দ্রমুখোপাধ্যায়রচিতঃ "মহাত্মা গান্ধী – জীবন ও অভিমত সংগ্রহ" ইতি নাম্না কশ্চন গ্রন্থঃ। অস্য প্রকাশনকালঃ অষ্টাদশোত্তোনবিংশতিশততমেশবীয়াব্দঃ। এতদনন্তরং ১৮১৮-১৯২৫ ঈশবীয়াব্দং যাবৎ রচিতেষু বঙ্গীয়গ্রন্থেষু গান্ধী ভগবদবতাররূপেণ বর্ণিতঃ অভবৎ। তথাহি নারায়ণচন্দ্রমুখোপাধ্যায়ঃ তস্য লঘুগ্রন্থে কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবানাং সাহায্যং কুর্বতা শ্রীকৃষ্ণেন সহ গান্ধিনঃ তুলনা কৃতা। নবীনচন্দ্রসাহামহাশয়েন "মহাত্মা গান্ধী : অবতার ও যুগলক্ষণ" ইতি গ্রন্থে কল্কি-অবতাররূপেণ গান্ধিনঃ বর্ণনা কৃতা। সতীশচন্দ্রদাসগুপ্তমহাশয়ঃ "গান্ধীর অষ্টোত্তর শতনাম" ইতি গ্রন্থরচনয়া সাক্ষাৎ দেবতারূপেণ গান্ধিনং নিরূপিতবান্। এবমেব মনোজমোহনবসোঃ "যুগাবতার গান্ধী" ইতি নাটকে, মন্মথকুমাররায়স্য "নতুন ঢেউ" (১৯২৪-খ্রীষ্টাব্দে) ইতি কাব্যে, উপেন্দ্রনাথগঙ্গোপাধ্যায়স্য "রাজপথ" এই কাব্যে গান্ধীয়চিন্তাধারায়াঃ প্রভাবঃ দরীদৃশ্যতে।

গান্ধিমতাদর্শানুপ্রেণিতসাহিত্যিকেষু সত্যেন্দ্রনাথদত্তঃ (১৮৮২ – ১৮২২) অন্যতমঃ। দক্ষিণ-আফ্রিকামহাদেশে গান্ধিনঃ সংগ্রামবিষয়মাধারীকৃত্য তস্য কবিতা আসীৎ "ইজ্জতের জন্য" ইতি। এবমেব "চরখার গান", "চরখার আরতি" চেতি কবিতাদ্বয়েন কবিনা বঙ্গদেশে চরখাশিল্পস্য প্রচারঃ কৃতঃ। গান্ধিনঃ ইহলোকপরিত্যাগস্য একবৎসরাৎ পূর্বং তেন রচিতায়াং "গান্ধীজী" ইতি কবিতায়াং বুদ্ধ-খ্রীষ্ট-টলস্টয়-সক্রেটিসপ্রভৃতিভিঃ সহ গান্ধিনঃ তুলনা দৃশ্যতে।

বিশ্বকবেঃ রবীন্দ্রনাথস্য "বৌঠাকুরাণীর হাঠ" (১৮৮৩), "রাজর্ষি" (১৮৮৭), "বিসর্জন" (১৮৯০), "প্রায়শ্চিত্ত" (১৯০৯), "মুক্তধারা" (১৯২২), "পরিত্রাণ" (১৯২৯) চেত্যাদিষু রচনাসু গান্ধীয়মতাদর্শস্য প্রভাবঃ দ্রষ্টুং শক্যতে।

বঙ্গীয়কবিষু তারাশঙ্করবন্দ্যোপাধ্যায়মহোদয়ঃ গান্ধিবাদং স্বজীবনদর্শনরূপেণ গৃহীতবান্। তস্য "ধরিত্রীদেবতা", "কালিন্দী", "গণদেবতা", "পঞ্চগ্রাম", "আরোগ্যনিকেতন" প্রভৃতিষু রচনাসু গান্ধিবাদস্য প্রভাবঃ পরিলক্ষ্যতে।

এবং বিচারে ক্রিয়মাণে এতদ্ বক্তুং শক্যতে যৎ বঙ্গীয়সাহিত্যে গান্ধিবাদস্য প্রভাবঃ আসীদেব। যদ্যপি তদানীন্তনকালে বঙ্গদেশে উগ্রজাতীয়তাবাদস্য প্রাবল্যম্ আসীৎ, তথাপি ভারতীয়রাজনীতৌ গান্ধিনঃ মতাদর্শঃ বঙ্গীয়সাহিত্যং প্রভাবিতবান্ ইতি নিশ্চয়েন বক্তুং শক্যতে।

NON-VIOLENT SOCIETY: A PROSPECT

Dr. Pankoj Kanti Sarkar
Assistant Professor
Department of Philosophy
Debra Thana Sahid Kshudiram Smriti Mahavidyalaya

In this age of the rule of brute force, it is almost impossible for anyone to believe that anyone else could possibly reject the law of final supremacy of brute force. Our society is proceeding towards such a distinction which is definitely being a future fall of uncertainty. And this is really not a good sign for our next generation, even for us. At present violence, genocide, murder, kidnaps etc. became the order of the day and day by day the situation is becoming bad to worse. Gandhi himself believed that non-violence is definitely superior to violence; forgiveness is manlier than punishment. He imagined a peaceful society free from any sort of violence which is built on the principle of violence.

Non-violence is defined in some modern discourses as a philosophy and strategy for social change that rejects the use of physical violence. As such, non-violence is an alternative to passive acceptance of oppression and armed struggle against it. Practitioners of non-violence may use diverse methods in their campaigns for social change, including critical forms of education and persuasion, aggressive civil disobedience and non- violent direct action and targeted manipulation of mass media. With the rise of systematic philosophy and religious concept, the concept of non-violence gradually came into existence. The present notion of non-violence is closely associated with the great Indian, political, social activist and thinker M K Gandhi. For his theory, Gandhi acknowledged his debt to Hinduism, Buddhism, Christianity, Thoreau, Tolstoy and many other sources.

India is a unique in its religious, linguistic and cultural diversity. It is really difficult to produce unity and harmony in such a country by non- violent means where the inherent tendency of groups is to dominate over the other (there may be some exceptions). Moreover, complete non-violence cannot be realized until and unless a harmony in the world as a whole is produced. It's a difficult task is to see whether and how such a non-violent society can be established. However, it is fundamentally irrational to use violence to achieve a peaceful society. A non-violent society cannot be brought into existence by violent means. Non-violence is the demand of a society to be formed. Gandhi's principle of non-violence is the soul force that has influenced so many societies and countries. His concept of non-violence is our inspiration and weapon to fight against violence.

Tagore's 'Gandhicharcha'

An Abstract

By Ranjan Kumar Auddy

Assistant Professor

Heramba Chandra College, Kolkata

Mohandas Karamchand Gandhi is not only a historical figure described as the father of the Indian nation, but he is also a subject of international dimension and repute; he is a part of Bengali life, politics and culture. My paper attempts to explore how Mahatma Gandhi emerged as a subject in the twentieth century during his lifetime. Particularly this paper highlights the role Rabindranath Tagore played in initiating what may be described as 'Gandhi Charcha'. It is well-known that Gandhi and Tagore had reciprocal admiration and respect as well as conflict of opinions between them. The legacy of their correspondence, interaction and frequent reference to each other contributed to the development of Rabindracharcha and Gandhicharcha simultaneously. For example, as Tagore was called 'Gurudev' by Gandhi, Tagore emerged as Gurudev beyond Santiniketan for all Indian nationalists. Simultaneously, although Gandhi was fondly called 'Bapuji' by Congressmen he emerged as the 'Mahatma' of the modern times thanks to Tagore's 'Gandhicharcha'. Tagore's 'Gandhicharcha' was far from idolatry. His disapproval of burning of clothes and of 'khadi', his support of Gandhi's fasting against the proposal of separate electorate in 1932, his whole-hearted praise – in one of his speeches - of Subhas Chandra Bose after the latter resigned from Presidentship of INC and his reminding his audience simultaneously that he is not upholding Bose against the Mahatma; all these actions, opinions and support have constructed a rich legacy of 'Gandhicharcha'.

Keywords: Gandhi, 'Gandhicharcha', 'khadi', swaraj.

Gandhi's Concept of Truth

Gour Hari Mondal

Assistant Professor

Dept. of English

Sabang Sajanikanta Mahavidyalaya

The word satya(Truth) is derived from Sat which means 'being'. Nothing is or exists in reality except Truth. That is why Sat or Truth is perhaps the most important name of God, in fact it is more correct to say that Truth is God than to say God is Truth. We learn from his Introduction to *The Story of My Experiments with Truth* that Gandhi's search for Truth was a search for personal liberation. Truth was for him the kind of ultimacy that can only be ascribed to the ultimate reality, what he also describes in the capitalized 'Absolute Truth'. He was writing in 1925: 'what I want to achieve-what I have been striving and pining to achieve these thirty years- is self-realization, to see God face to face, to attain *Moksha*. Evidently, his discovery of Truth would involve in some way a liberation from the self, moksha, which was in turn, paradoxically, a realization of the self.

Key Words: Truth, Personal liberation, Moksha

WOMEN EMPOWERMENT FROM GANDHI'S PERSPECTIVE

DR. KRISHNA PASWAN
ASSISTANT PROFESSOR
DEPARTMENT OF PHILOSOPHY
SILIGURI COLLEGE

In this paper the author tries to describe the empowerment of women in the light of Gandhi's point of view. The status of women in India has been subject to many great changes over the past few millennia. From equal status with men in ancient times, through the low points of the medieval period, to the promotion of equal rights by many reformers. One of them is Mahatma Gandhi. The history of women in India has been eventful. Today the empowerment of women has become one of the most important concerns of 21st century. But practically women empowerment is still an illusion of reality. We observe in our day to day life how women become victimized by various social evils. Undoubtedly the father of the nation, Mahatma Gandhi experimented in this field a century ago and he had shown the way for the empowerment of women and the development of the status of women. Gandhi was of the opinion that until and unless women, on the basis of education and knowledge do not find their proper place in social and economic fields, they could not achieve self- respect for themselves.

গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ ঃ সাক্ষাৎ ও সম্পর্ক

ড. মিঠু জানা
বিভাগীয় প্রধান
বাংলা বিভাগ
হিজলী কলেজ

গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ আমাদের চিরায়িত ভারতাত্মার দুই বিগ্রহ। দুজনেই সত্য, শিব আর সুন্দরের পূজারী। যে অহিংসার পথ ও মতে বিশ্বাসী গান্ধীজি ভারতের মুক্তি প্রত্যাশী ছিলেন — সেই পথই সাহিত্যে রূপ পেয়েছে বিশ্ববন্দিত রবীন্দ্রনাথের কলমে। হিংসা নয় প্রেম, বিদ্বেষ নয় ক্ষমা আর ভোগ নয় ত্যাগের মহত্ত্বতার মন্ত্রে সকল ভারতবাসীকে দীক্ষিত করেছিলেন এই দুই মহর্ষি। সনাতন ও আধুনিক ভারতবর্ষকে তাঁরাই মিলিয়ে দিয়েছিলেন অন্তরে। এই মহান ব্রতে যুগপৎ গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অটল, অনড়।

গান্ধীজি ও রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিনিকেতনে। এর ফলে একদিকে রবীন্দ্রনাথের 'ব্রহ্ম চর্যাশ্রম' আর অন্যদিকে গান্ধীজির 'ফিনিক্স স্কুল'-এর মধ্যে পারস্পরিক ভাববিনিময় ঘটে। ফলতঃ তৈরি হয় পথ চলার এক নবরূপরেখা। কর্ম ও জীবনের মেলবন্ধনে শুরু হয় গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শে নবভারত গঠনের উদ্যোগ ও উদ্যম। কর্ম ও জীবনের মেলবন্ধনে শুরু হয় গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শে নবভারত গঠনের উদ্যোগ ও উদ্যম। গান্ধীজি ছেচল্লিশ আর রবীন্দ্রনাথ চুয়ান্ন। কিন্তু এখানেই শেষ নয়—সম্পর্ক, সৌহার্দ্য আর মতাদর্শে এই সম্পর্ক স্থায়ীত্ব পেয়েছিল আমৃত্যু।

গান্ধীজি ও তাঁর 'চরকা' নীতি

ড. চঞ্চল কুমার মন্ডল
অংশকালীন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সবং সজনীকান্ত মহাবিদ্যালয়

বিশ্বের ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ জননায়ক হলেন – মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম এক ব্যতিক্রমী রাজনৈতিক চিন্তানায়ক হিসেবে তিনি আরও পৃথিবীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। এই উজ্জ্বলতম স্বদেশচেতা ব্যক্তিত্বের জন্ম ঃ ২রা অক্টোবর ১৮৯৬ এবং মৃত্যু ঃ ৩০ শে জানুয়ারী ১৯৪৮-এ।

স্বদেশী আন্দোলনেরকালে ভারতীয় বিপ্লবীগণ যখন 'সহিংস' বিপ্লবের পথ মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন;ঠিক সেই সময় এই মহান উদার স্বদেশ চেতনা সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের মানুষটি স্বদেশবাসীকে 'অহিংসার' পথে দীক্ষা দিতে তৎপর হলেন। কারন, তিনি দেখলেন সমগ্র ভারতবর্ষের নর-নারীগণ জাতি-ধর্ম-বর্ণের বিদ্বেষে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পড়েছে। এই অনৈক্যের সুযোগে বিদেশী শাসকগণ সদম্ভে ভারতবাসীদের শাসনের রক্তচক্ষুতে দাপিয়ে রাখতে পেরেছে। আবার ভারতীয় উচ্চবিত্ত অভিজাত সম্প্রদায়ের নেতৃত্বগণ বৃহত্তর জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন। ইংরেজ শাসকগণও 'বঙ্গভঙ্গে'র মাধ্যমে হিন্দু মুসলমান ঐক্যে ফাটল ধরাতে তৎপর হলেন। এমন পরিস্থিতিতে গান্ধীজি 'অহিংস' বিপ্লবের পথে মুক্তির সন্ধান করার আহ্বান জানালেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি স্বদেশ বাসীদের আগে স্বনির্ভর করে তুলতে চাইলেন। বিদেশি দ্রব্য বর্জন করে স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ করার দীক্ষা দিতে তৎপর হলেন তাঁর 'চরকা' নীতির মধ্য দিয়ে। নিজ হাতে চরকায় কাটা সুতোর তৈরী বস্ত্র পরিধানের আহ্বান জানালেন স্বদেশবাসীদের। গান্ধীজির এই 'চরকা' নীতির গভীর তাৎপর্য যাঁরা বুঝতে পারেননি, তাঁরা বিরোধিতা করেন।

কিন্তু তিনি ঐ 'চরকা' নীতির মধ্য দিয়ে স্বদেশবাসীদের আত্মত্যাগ ও আত্মশুদ্ধির পথ দেখান। স্বরাজের জন্য স্বদেশবাসীকে শ্রমযোগী, কর্মযোগী করে তুলতে চেয়েছিলেন ঐ 'চরকা' নীতির মধ্য দিয়ে। স্বদেশবাসীর আত্মশক্তি জাগরণ ও ঐক্য চেতনার মূলমন্ত্র হল ঐ 'চরকা' নীতি। বঙ্গে গোহত্যা নিষেধ, মদ্য পান সহ হরিজন আন্দোলনের মতো অসংখ্য শ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কর্তা ও ভারতীয় মুক্তি আন্দোলনের অহিংসবাদী ঐ 'চরকা' নীতির জনক তথা স্বাধীন ভারতের জাতির জনক হিসেবে তিনি সবার পূজাপাদ হয়ে ওঠেন। টাকার নোটের মধ্যে বন্দী এই আদর্শ মহাপুরুষের ছবি আজও জ্বল-জ্বল করে।

M.K. GANDHI'S PHILOSOPHY OF EDUCATION IN THE CONTEXT OF PRESENT EDUCATION SYSTEM OF WEST BENGAL

Dr. Krishna Prasad Bar
Guest Teachers, Dept. of Education
Sabang Sajanikanta Mahavidyalaya

M.K. Gandhi, the lovely and very good minded Universal personality, who was born in India in the modern age. He is the politician, the Philosophy, the socialist and the educationist. Then according to Gandhi, acquiring the right knowledge and all round development of body, mind and spirit should be the goal of our education.

Gandhi is not in favour of the Present System of Primary education, because this system of education merely makes man literate. But he want's to establish a co-ordination with parallel development of '3H' means to the Head, Heart, and the Hand. As a result it means to observe here the Picture i.e. Intellectual, Emotional development with work culture of human together all over thee West Bengal.

Then the Present System of Secondary Education will be a form co-ordination and relation different subject which is included in curriculum and education faculties, on that context Gandhi means to say that it gives to Paralles significance to Liberal and vocational education system of contemporary in West Bengal.

Gandhi wanted to apply to Highly modern scientific system of education in West Bengal. So stating that according to the national requirements through the research paper an attempt has been made to analyze how far his through on education are relevant in the age of globalization, particularly in West Bengal context.

GANDHIAN'S VIEW ON TEACHING-LEARNING PROCESS

Himansu Kumar Mandal
Asst. Professor
Dept. of History
Sabang Sajanikanta Mahavidyalaya

According to Handhiji "Education is an all round drawing out of the best in child and man-body mind and sprit. The morality and human values of the youth of our country have been decreasing day by day as the system of education gives the youth a little insight in their national heritage, culture and values. He emphasizeel on the development of 3Hs (Head, Heart, Hand) instead to 3Rs (Reading, writing and Grith Metic). Gandhiji appr to education is thus the root of solutions of social educational problems. Gandhian approach to learning is construction and holistic in nature. Mahatma Gandhi suggested activity based methods of learning for effective and purposeful learning. He advocated as system of education which is based on self orientation. He wanted to begin child's education through teaching a useful handicraft on activities.

Gandhijian's view on the teaching learning process for building up of a new social order based on tolerance truth. His craft centric education was determined by the needs of the people and by the needs of the society. The whole teaching learning process is geared is the needs and interests of purpils.

Keywords : Gandhiji, Education, Constructions, Holistic, Tolerance, Determination, Development.

জাতীয়তাবাদ ঃ রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী

ড. মহ বতুন্নেসা খাতুন
সহকারী অধ্যাপিকা
হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়

একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে আমরা দেশে আচ্ছে দিন আনার স্বপ্ন দেখছি। প্রচার মাধ্যমে ডিজিটাল ইন্ডিয়ার চিত্তাকর্ষক বিজ্ঞাপন দেখছি। স্বাধীনতার বাহাত্তর বছর পরেও আমরা গান্ধীজি, নেতাজি, রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের ভারতবর্ষকে খুঁজে পেয়েছি কি ? এই ভাবনা থেকেই এই প্রবন্ধের বিষয় নির্বাচন – জাতীয়তাবাদ রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী। ভারতবর্ষের এই দুই মণীষীর জাতীয়তাবাদ নিয়ে বর্তমান প্রবন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে। জাতীয়তাবাদ কি ? এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির ভাবধারায় যে মতানৈক্য ছিল সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই দুই মহামানব ছিলেন স্বাধীন ভারতবর্ষের পূজারী। তারা তাঁদের কর্মের মধ্য দিয়ে ভারতবাসীকে স্বাধীন ভারতবর্ষ গড়ার স্বপ্ন দেখিয়েছেন। তাঁদের দুজনের মধ্যে আদর্শগত দিক থেকে মতানৈক্য ছিল ঠিকই;কিন্তু বন্ধুত্ব ছিল অকৃত্রিম। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে গান্ধীজি ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেই গর্জে ওঠেন। গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। চরকা আন্দোলন, স্বরাজ, বিলাতি কাপড় বর্জন, অনশন, হরতাল, কর প্রদানে অসহযোগিতা – গান্ধিজীর এই মতকে রবীন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারেন নি। জাতীয়তাবাদ নিয়ে গান্ধীজির আকাশচুম্বী আবেগ ছিল। রবীন্দ্রনাথ মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় চরকা নিয়ে একটি ব্রবন্ধ লিখলেন 'The cult of the Charka' এখানে চরকা আন্দোলন নিয়ে সমালোচনা নয়, কিন্তু স্বরাজ ও জাতীয়তাবাদ নিয়ে মতপার্থক্য ছিল গান্ধীজির সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের এ জাতীয়তাবাদ আগ্রাসী বা বংসাত্মক নয়। জাতীয়তাবাদ বলতে তিনি মনে করতেন বিশ্বমানবতা। গান্ধীজি যেখানে জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন, সেখানে রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদ বলতে আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। ১৯২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জোড়াসাঁকোতে তাঁদের দুজনের মধ্যে জাতীয়তাবাদ নিয়ে কথা হয়। ভারতের জাতীয় ভাষা নিয়েও তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল। গান্ধজি চেয়েছিলেন হিন্দি ও উর্দু ভাষা ভারতের জাতীয় ভাষা হোক; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন ইংরেজী ভাষাকে। গান্ধীজির সঙ্গে বাংলা তথা রবীন্দ্রনাথের নিবিড় ও গভীর সম্পর্ক ছিল। ১৯১৫-১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির মধ্যে জাতীয়তাবাদ ও ব্যক্তিগত বিষয়ে অনেক চিঠি পাওয়া যায়, যেখানে তাঁদের মতানৈক্য ও বন্ধুত্ব উভয়েরই পরিচয় পাওয়া যায়। গান্ধীজি সাউথ আফ্রিকা থেকে ফিরে এক সপ্তাহের জন্য শান্তিনিকেতনে আসেন এবং কবিগুরুর আশ্রম পরিদর্শন করেন। এই আশ্রমের শিক্ষক ও ছাত্রদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর মুগ্ধতার কথা জানান। কিন্তু সেখানেও তিনি যে মতামত দেন, সি বিষয়ে কবিগুরুর আপত্তি ছিল। রাউলাট অ্যাক্ট নিয়ে কিন্তু গান্ধীজির সঙ্গে কবি একতম ছিলেন। ১৯১৫ খ্রীঃ ৬ই মার্চ তাঁদের দুজনের প্রথম সাক্ষাৎ। সত্য, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, শিক্ষা, মানবতা – বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। ১৯৪০ খ্রীঃ গান্ধীজি পুনরায় শান্তিনিকেতনে আসেন। সেই সময় কবি গান্ধীজিকে শান্তিনিকেতনের দায়িত্ব নেওয়ার কথা বলেন। একদিনে যেমন আমরা মহাত্মা ও কবিগুরুর অমিল দেখি, অন্যদিকে আবার তাঁরা ছিলেন একে অপরের পরিপূরক। ভারতের দেশধর্মের ভিত্তি অহিংসা, সহিষ্ণুতা, মানবতা এবং বহুধর্মের ধারাকে বজায় রাখা। তাই ভারতের অধঃপতন করতে মেকি জাতীয়তাবাদ ছেড়ে সমন্বয়ের সাধনায় এগিয়ে আসতে হবে, যে সমন্বয় দেখিয়ে গিয়েছেন দুই মহান ভারতীয় – রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজি।

Mahatma Gandhi and the concept of protection of environment

Dr. Bijoy Debnath
Dept. Of Commerce
Sabang Sajanikanta Mahavidyalaya

The horrific pictures of the forest fires of the Amazon once again have brought the issues of environmental degradation in the forefront of serious discourses. Issues of ever depleting nature and for that matter environment are grave in nature and requires well thought out measures. Thousands of environmental organisations mostly floated by erstwhile hunters, jamindars or foresters lack the deep understanding of the problem.

Mahatma Gandhi's illustrious statement that the earth can fulfil the needs of the whole human being but cannot satisfy a single person's greed is a crux of understanding the problem. His views on sustainable use of resources and minimal damage to the environment for the sake of future generations are little known to the present generation. He preached simple living and high thinking, by this benign preaching he actually wanted to signify a whole lot of things, starting from relation between nature and humankind; relation between village and sustainable development; and the synergy between rural development and industrial development. His view on environment is particularly relevant in this day and age, when the threat of climate change is looming large and natural resources are depleting fast. In Bengal, Gandhi's political as well as religious life is discussed at length but, his views on nature and its sustainable use hardly finds a place in dinnertime anecdotes. It is not because that Bengal is immune to environmental degradation but because of the fact of Gandhi's political stature and his much hyped relationships with Rabindranath Tagaore and Netaji Subhash Chandra Bose. The present paper tries to unearth the less known wisdom of Gandhiji for giving an insight to present generation of the Bengal to tackle the ecological challenges of the state.

Keywords: environment, degradation, sustainable, politics

বাংলায় ভারত ছাড়ো আন্দোলন

কেয়া চৌধুরী
অংশকালীন অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ
সবং সজনীকান্ত মহাবিদ্যালয়

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে গান্ধীজির আবির্ভাব এক নতুন গতির সঞ্চার করে। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে জাতি যখন কিছুটা লক্ষ্যভ্রষ্ট ও দিশাহারা, কংগ্রেসের পুরানো নেতৃত্ব যখন ক্রমশঃ তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলছিল, বিক্ষিপ্ত সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন উত্তেজনার খোরাক যোগালেও অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিচ্ছিল, তখন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সম্পূর্ণ নতুন খাতে প্রবাহিত করতে এগিয়ে এলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। তাঁর সম্মোহিনী ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম। আপামর জনসাধারণের মধ্যে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন দেশপ্রেমের জন্য আত্মত্যাগের মহান আদর্শ, দমে যাওয়া মানুষের বুকে সঞ্চার করেছিলেন নতুন আশা। পিছিয়ে পড়া নির্যাতিত মানুষের মনে জাগিয়ে ছিলেন চেতনা ও ভবিষ্যতের রঙ্গীন স্বপ্ন।

ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তিনি অনেকগুলি আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন তার মধ্যে ১৯৪২ সালের আগস্ট বা 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণ পৃথক চরিত্রের। ব্যাপ্তির দিক থেকে 'ভারত ছাড়ো' সমস্ত আন্দোলনকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। এই আন্দোলনের বিস্তার ঘটেছিল সারা ভারতবর্ষ। বাংলাতেও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

বাংলাতে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল কলকাতা, ঢাকা, মেদিনীপুর, হুগলী এবং বীরভূম ও জলপাইগুড়ি জেলার কোন কোন অংশ। কলকাতার স্কুল কলেজের ছাত্ররা ক্লাস বয়কট করে বিভিন্ন অঞ্চলে মিছিল, সভা সমাবেশ ও পথ অবরোধের মাধ্যমে আন্দোলনের সূত্রপাত করে। ঢাকা শহরে সহকারী কার্যালয়গুলি আক্রান্ত হয়। বাংলাদেশের মধ্যে মেদিনীপুর জেলার তমলুক ও কাঁথি মহকুমায় 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন সবচেয়ে বেশী তীব্র আকার ধারণ করেছিল। মেদিনীপুর ও হুগলীতে যেসব নেতা এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে সতীশচন্দ্র সামন্ত, অজয় মুখোপাধ্যায়, সুশীল ধাড়া, ভীমাচরণ পাত্র, প্রফুল্ল চন্দ্র সেন, হরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় মেদিনীপুরের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন — 'There was a deliberate challenge thrown out to the Government' এখানে থানা, সরকারী কার্যালয়, ডাকঘর ও আদালত আক্রমণ ছিল প্রধান কর্মসূচী। এই উদ্দেশ্যে মহিষাদল, সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম তমলুক ''বিদ্যুৎ বাহিনী'' নামে স্বেচ্ছাসেবী দল গঠন করা হয়। ২০,০০০ মানুষের এক বিশাল মিছিল তমলুক থানা দখল করতে অগ্রসর হলে পুলিশ গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে মাতঙ্গিনী হাজরা শহীদ হন। মেদিনীপুরের বিদ্রোহ অনেকাংশ সফল হয়েছিল এবং বেশ কয়েকটি থানা বিদ্রোহীদের হাতে চলে যায়। ১৭ই ডিসেম্বর তমলুকে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত জাতীয় সরকার তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। সরকারী দমন নীতির জন্য জাতীয় সরকারের পতন ঘটে। এই সময় গান্ধীজিও জাতীয় সরকারের অবসানের জন্য নির্দেশ দেন।

যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু হলেও ইংরেজদের দমন নীতির ফলে শেষ পর্যন্ত তা ব্যর্থ হয়। ১৯৪৪ সালের ১লা আগস্ট গান্ধীজি আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হলেও পরবর্তীকালে স্বাধীনতা আসতে বেশী দেরী হয়নি।

মহাত্মা

পাপিয়া মান্ডী
সহ-অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ
সবং সজনীকান্ত মহাবিদ্যালয়

Indian Constitution Art. 19(1)- Freedom of Speech and Expression

"Know the truth as truth and untruth as untruth" - Buddha

Indian Council Act 1919 :

অনেকগুলি অধিকারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য--

১)অল্প সংখ্যক অভিজাত সমপ্রদায়ের মধ্যে সম্পত্তি, Tax বা Education-এর উপরে ভিত্তি করে ভোটাধিকার প্রদান করা হয়েছিল।

২) পৃথক নির্বাচন প্রদান করা হয়েছিল-

শিখ, Indian Christian , Anglo Indian এবং Europianদের ।

তবে ,বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এই আইনের বিরোধিতা করে এবং ডঃ আম্বেদকর দলিতদের জন্যও পৃথক নির্বাচনের দাবি তোলেন।

আইন সংশোধন ও ভারতীয়দের দাবিদাবা পুনর্বিচার করার উদ্দেশ্যে ১৯২৮ সালে ভারতে আসে সাইমন কমিশন ।গান্ধিজী ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এর বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন । তবু ১৯৩০ সালে সাইমন কমিশন তার রিপোর্ট পেশ করে ।

1ST Round Table Conference (1930)-এর আয়োজন করা হয় এই রিপোর্ট এর উপর ভিত্তি করে । গান্ধিজী ও তাঁর রাজনৈতিক দল বাদে এতে অংশগ্রহন করে -

১) মুসলিম লিগ ২) হিন্দু মহাসভা ৩) লিবারেলস ৪) প্রিন্সেস ৫)ডঃ আম্বেদকর ৬) শিখ ।

গান্ধি - আরউইন প্যাক্ট এর ফলে গান্ধিজী 2nd Round Table Conference(1931) এ যোগদান করেন । রামসে ম্যাকডোনাল্ড ছিলেন এর চেয়ারম্যান । সেখানে মৌনব্রত ধারণ করে থাকা গান্ধিজী প্রথম মুখ খুললেন ডঃ আম্বেদকরের দলিত সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচনের দাবি তোলার পর । এমনকি মুসলিম লিগের নেতাদের সাথে আম্বেদকরের বিরুদ্ধে একটা চক্রান্তের ছক কষেন। কিন্তু মুসলিম লিগ গান্ধিজীর সমর্থন না করায় তিনি একাই সরব হন ।তিনি হুমকি দেন -

" I would resist with my life the grant of seperate electorate."

(Famous letters of Mahatma Gandhi- R.L Khipple)

কিন্তু ম্যাকডোনাল্ড ১৯৩২ সালে দলিতদের জন্য Communal Awardsঘোষণা করলে জারভেদা জেলে গান্ধিজী আমরণ অনশন শুরু করেন।তাঁর অনুগামীরা আম্বেদকরকে খুনের হুমকির পাশাপাশি দলিত বস্তিতে আগুন জ্বালানোর ফলে ১৯৩২ সালে পুনাপ্যাক্ট স্বাক্ষর করতে বাধ্য হলেন আম্বেদকর।

এর বিরুদ্ধে গান্ধিজীর যুক্তি ছিল এটি হিন্দুদের মধ্যে বিভাজনের সৃষ্টি করবে যেটা খবই হাস্যকর। কারণ হিন্দু মহাসভার নেতা মুঞ্জেও দলিতদের দাবিকে সমর্থন করেছিলেন।

শূদ্র বাদে তিন বর্ণের উপনয়ন করা হয় (মনু ১০:৪) ,ব্রাহ্মনের পরিচর্যা করাই শূদ্রের একমাত্র ধর্ম (১০:১২৩) ,ব্রাহ্মনের পরিত্যক্ত অন্ন, বস্ত্র দ্বারাই শূদ্র তার দিনাতিপাত করবে (১০:১২৫) ,শূদ্র বেদ শ্রবণ করলে রাজা তার কর্ণে গরম সীসা ঢেলে দেবেন (৪:৯৯)। এই মনুবাদী নীতিতেই বোধ হয়, গান্ধি বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তিনি লিখেছেন--

"The beauty of the caste system is that it does not base itself upon distinctions of wealth possessions...Both are governed by blood and heredity...It is the best possible adjustment of social stability and progress. "

(Young India, Dec-29, 1920)

"He was never a Mahatma, I refused to call him, Mahatma" - Dr. Ambadkar, 1955 interview for BBC

বাংলার শিরায় শিরায় গান্ধীবাদ

সুভাষ উপাধ্যায়
ছাত্র, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক বলিষ্ঠ তম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হলেন জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী। তিনি একাধারে যেমন রাজনীতিবিদ, অন্যদিকে একজন সুদক্ষ দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ। তাঁর মনন ও চিন্তনের বর্ণময় আলোক ছটার বিচ্ছুরণ আমাদের সমগ্র ভারতবর্ষের সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা, দর্শন প্রভৃতি ক্ষেত্রকে আলোক উদ্ভাসিত করে তুলেছে। তাঁর এই বিশাল জীবনের রূপরেখা একটি গবেষণা নিবন্ধের মাধ্যমে তুলে ধরা সম্ভব নয়,এ কেবল স্বপ্নের মাধ্যমে বিশ্ব দর্শনের ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র।

গান্ধীজী স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র তথা বঙ্গভূমির সঙ্গে তার এক আত্মিক যোগাযোগ গড়ে ওঠে। সেই কারণে ২০১৯ সালে গান্ধীজীর জন্ম সার্ধশতবর্ষে এসে তাঁকে স্মরণ বঙ্গবাসীর কাছে স্মৃতিচারণের এক শুভ মুহূর্ত। এই সুযোগেই আমরা গান্ধীজীর রাজনৈতিক কর্মপ্রয়াস, আধ্যাত্মিক দর্শন তত্ত্ব, সুচিন্তিত শিক্ষা পরিকল্পনা, সমাজ ও তার সাহিত্যিক কর্মক্ষেত্রের কিছু নিদর্শন কথা আলোচনা করব। এই আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা সেই সিদ্ধান্ত উপনীত হব বঙ্গভূমিতে গান্ধী চর্চা কতখানি প্রাসঙ্গিক।

গান্ধীজী লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্যারিস্টারি পাস করে যখন দেশে ফিরে এলেন ভারতবর্ষ তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে বিধ্বস্ত। তিনি পরাধীনতার নাগপাশে বন্দী বঞ্চিত, নিষ্পেষিত, পদদলিত, নির্যাতিত, অবহেলিত সাধারণ মানুষজনের মনের দহন জ্বালা অনুভব করেছিলেন। এর কারণেই তিনি চম্পারন সত্যাগ্রহ, খেদা সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান করেন। এরপর থেকে তিনি দেশীয় আঞ্চলিক আন্দোলন গুলিকে সুযোগ্য নেতৃত্ব দানের মাধ্যমে জাতীয় আন্দোলনে রূপ দেওয়ার কাজে সর্বক্ষণ নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন। এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী করে তোলার কর্মোদ্যম এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার চেষ্টা তাঁকে জাতির জনকে পরিণত করেন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে সংগঠিত অসহযোগ আন্দোলনকে দেখে তৎকালীন বাংলার(অবিভক্ত) রাজশাহী রংপুর, পাবনা, দিনাজপুর, বীরভূম, মেদিনীপুরের কাঁথি ও তমলুকের কৃষকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলন গড়ে তুলে। এই প্রসঙ্গে অমলেশ ত্রিপাঠী বলেছেন - 'গ্রামাঞ্চলগুলি নতুন উৎসাহের প্রাবল্যে প্রাণ চাঞ্চল্য নিয়ে জেগে উঠলো'।তিনি আইন অমান্য আন্দোলন ডাক দেন। সেই আন্দোলনের ঢেউ আমাদের বঙ্গভূমিতেও এসে পৌঁছায়। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি সেখানেও দেখতে পাই গান্ধীজীর উজ্জ্বল উপস্থিতি। সেই আন্দোলনকে সর্বভারতীয় আন্দোলনে পরিণত করার জন্য তিনি বঙ্গভূমির ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বাংলার আগস্ট আন্দোলনের মূলকেন্দ্র ছিল কলকাতা, ঢাকা, মেদিনীপুর, হুগলিসহ বিভিন্ন জায়গা। মেদিনীপুর জেলার তমলুক ও কাঁথি মহকুমায় এই আন্দোলন সবচেয়ে তীব্ররূপ ধারণ করেছিল। গান্ধীজীর নেতৃত্বের প্রকৃতি নির্ণয় করতে গিয়ে অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী লিখেছেন -' _ ব্যক্তি হিসেবে এরকম জটিল চরিত্র ইতিহাসে দুর্লভ। তাঁর মধ্যে বিচিত্র, অনেক সময় আপাত বিরোধী, চৈতন্যের স্তর লক্ষ্য করি।কখনও তিনি ভিক্টোরীয় যুগের সুভদ্র উদারতন্ত্রী, কখনো বা আপোসহীন নৈরাজ্যবাদী; কখনও গীতার স্তিতপ্রজ্ঞ সন্ত কখনো বা কৌটিল্য সদৃশ ঝানু রাজনীতিজ্ঞ; এই মুহূর্তে ঐতিহ্যশ্রয়ী রক্ষণশীল হিন্দু,ধনিকের মুখপাত্র; পরমুহূর্তে বেপরোয়া সমাজ সংস্কারক , সংগ্রামী কৃষকের সহযোদ্ধা; একই সঙ্গে জাতীয়তাবাদী ও আন্তর্জাতিক ধ্যান ধারণার মূর্ত প্রতীক।'

Mahatma Gandhi's Views on Rural Economic Self-sufficiency: Relevance in Today's Rural West Bengal

Dr. Selim Chisti
Associate Professor in Economics
Sabang Sajanikanta Mahavidyalaya

The aim of Mahatma Gandhi, a multifaceted personality, was to achieve enlightenment by serving the nation. He accomplished it through his creative thoughts and diverse activities. Many forms of his creative activities were completely associated with the economic wellbeing of nation. Rural agrarian economy is the heart of Indian economy. He opined that economic self-sufficiency for an individual as well as for a nation as a whole is inescapable. His stress on rural economy and emphasis on a simple life, coupled with his concern for universal well-being formed the foundation of his unique views on economics. Gandhi's economic views were based largely on his understanding of the Indian situation. This led him to ponder and to concentrate on various economic problems of rural India and work out several action plans for solving those problems and ultimately reaching towards rural economic self-sufficiency.

Gandhi has strongly advised for expansion of small-scale industries in villages, which will ultimately trim down the burden on rural agrarian economy of India. The expansion of small-scale industry in rural part of India can toil as a good support system for producing glut in rural economy. If every village distributes its glut to the poor villagers then the problem of poverty and starvation would not arise. The economy of West Bengal, one of the major states of India, is till today is village based economy. By producing glut in rural part of West Bengal economy can easily reach economic self-sufficiency. Mahatma Gandhi's idea of village Swaraj will be reached. In this perspective this paper highlights on the relevance of Mahatma Gandhi's views on rural economic self-sufficiency in today's rural West Bengal

Key Words:

Mahatma Gandhi, Rural Agrarian Economy, Economic Self-sufficiency, Small Scale Industry, West Bengal.

Library Services in the Prespective of Gandhiji

Ruksana Sultana
Librarian
Sundarban Mahavidyalaya

A library is an organization which has enriched collection of resources of books, periodicals, newspapers, manuscript, films, maps, documents, prints, cassettes, video games, e-books, audio books etc. Libraries often provide sufficient and quiet areas to the library users for studying. Mahatma Gandhi was a pragmatic democrat per excellence. He completely devoted his whole life for serving the nation for enhancing the social welfare of Indian citizen. His views were ramified in every corner of human life. He visualised the importance of human resource development through the provision of library services , to one and all, specially to poverty-ridden Indian citizen. In the process of developing human resource for all Gandhiji gave a rightful place to library services. His philosophy on library sevices almost concide with that of a famous library professional. This professional is none other than great library scientist, S. R. Ranganathan, who propounded Five Laws of Library Science. Mahatma Gandhi opined that for the library users in the case of students, the expense should not be much. He also opined that from an economic point of view, Lincoln's Inn is the best Inn, which boasts also the best library. He used to say libraries are parts and parcel of everyday life. Gandhiji laid emphasis on public libraries, laying special stress on the selection of books. He mainly focused for socio-economic development or vast poverty-ridden rural Indian mases via community sevives which is main aim of public library. Till today West Bengal is entrapped into pauperism . Public libraries of West Bengal are in a trauma, which are in a need for an urgent recovery. In this background this paper higlights on the relevance of Gandhi's views on library services for the upliftment of library users of poor economic bakground of today's West Bengal .

Key Words:

Public Library, Five Laws of Library Science, Lincoln's Inn, Mahatma Gandhi, West Bengal.

গান্ধীজীর দর্শনচিন্তা ও রাজনৈতিক জীবন

সন্তু দাস
ছাত্র, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

ভারতবর্ষে ইংরেজদের আগমন ঘটে ১৬৫১খ্রিঃ। ১৬৯১ সালে তারা কলকাতায় বসবাস শুরু করে এবং ১৮৫৮ সালে ভারতে ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটায়।এই শাসন চলতে থাকে ভারত স্বাধীনের পূর্বে পর্যন্ত।অর্থাৎ ইংরেজরা ভারত শাসন করে প্রায় ৩০০ বছর।ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষের অন্তিম লগ্নে মহামানব রূপে আবির্ভূত হন মোহোনদাস করমচাঁদ গান্ধি ওরফে মহাত্মা গান্ধি (২রা অক্টোবর, ১৮৬৯ - ৩০শে জানুয়ারি, ১৯৪৮) । তিনি ছিলেন সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। এ আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অহিংস মতবাদ বা দর্শনের উপর এবং এটি ছিল ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম চালিকা শক্তি, সারা বিশ্বে মানুষের স্বাধীনতা এবং অধিকার আদায়ের অন্যতম অনুপ্রেরণা।

গান্ধী তার জীবনকে সত্য অনুসন্ধানের বৃহৎ উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি নিজের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে, এবং নিজের উপর নিরীক্ষা চালিয়ে তা অর্জন করেছিলেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনীর নাম দিয়েছিলেন - দি স্টোরি অফ মাই এক্সপেরিমেণ্টস উইথ ট্রুথ, যার অর্থ সত্যকে নিয়ে আমার নিরীক্ষার গল্প। গান্ধী বলেন তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ ছিল নিজের অন্ধকার ভয় ও নিরাপত্তাহীনতাকে কাটিয়ে ওঠা। গান্ধী তাঁর বিশ্বাসকে প্রথম সংক্ষিপ্ত করে বলেন, ঈশ্বর হল সত্য। পরবর্তীতে তিনি তাঁর মত বদলে বলেন, সত্য হল ঈশ্বর। এর অর্থ সত্যই হল ঈশ্বরের ক্ষেত্রে গান্ধীর দর্শন।

গান্ধীজি দাদা আব্দুল্লা এন্ড সন্সের আইনজীবী হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় যান(১৮৯৩)। দক্ষিণ আফ্রিকা গান্ধীর জীবনকে নাটকীয়ভাবে পরিবর্তন করে দেয়।দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের ভোটাধিকার ছিল না। এই অধিকার আদায়ের বিল উত্থাপনের জন্য তিনি আরও কিছুদিন দেশটিতে থেকে যান। বিলের উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হলেও এই আন্দোলন সেদেশের ভারতীয়দেরকে অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছিল।একজন শিক্ষিত ব্রিটিশ আইনজীবী হিসেবে, গান্ধী প্রথম তাঁর অহিংস শান্তিপূর্ণ নাগরিক আন্দোলনের মতাদর্শ প্রয়োগ করেন দক্ষিণ আফ্রিকায় নিপীড়িত ভারতীয় সম্প্রদায়ের নাগরিকদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে। ভারতে ফিরে আসার পরে কয়েকজন দুঃস্থ কৃষক এবং দিনমজুরকে সাথে নিয়ে বৈষম্যমূলক কর আদায় ব্যবস্থা এবং বহু বিস্তৃত বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে আসার পর গান্ধী সমগ্র ভারতব্যাপী দারিদ্র্য দূরীকরণ, নারী স্বাধীনতা, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, বর্ণ বৈষম্য দূরীকরণ, জাতির অর্থনৈতিক সচ্ছলতা সহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রচার শুরু করেন। কিন্তু এর সবগুলোই ছিল স্বরাজ অর্থাৎ ভারতকে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে। ১৯৩০ সালে গান্ধী ভারতীয়দের লবণ করের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ৪০০ কিলোমিটার (২৪৮ মাইল) দীর্ঘ ডান্ডি লবণ কুচকাওয়াজে নেতৃত্ব দেন, যা ১৯৪২ সালে ইংরেজ শাসকদের প্রতি সরাসরি ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়।

১৮৮৫ খ্রিঃ ভারতে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয় ।তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভায় বক্তৃতা করেন, তবে ভারতীয় ইস্যু রাজনীতি এবং ভারতীয় জনগণের সাথে পরিচিত হন গোপালকৃষ্ণ গোখলের মাধ্যমে, যিনি ছিলেন তৎকালীন একজন সম্মানিত কংগ্রেস নেতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে (১৯১৪-১৯১৯)১৯১৫ সালের ৯ইজানুয়ারী গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে আসেন। এইজন্য ওই দিনটিকে প্রবাসী ভারতীয় দিবস হিসাবে পালন করা হয়।

ইংরেজ বিরোধী রাজনৈতিক পদক্ষেপ-

১).১৮৯৪ খ্রিঃ গান্ধিজী নাটাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন।
২).১৯১৯ সালে রাওলাট আইন বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন।
৩).১৯২০ খ্রিঃ তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন । গান্ধী ১৯২০ এর দশকের বেশির ভাগ সময় নীরব থাকেন, এ সময় তিনি স্বরাজ পার্টি এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মাঝে বাধা দুর করতে চেষ্টা করেন। অস্পৃশ্যতা, মদ্যপান, অবজ্ঞা এবং দারিদ্রতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন।
৪).১৯২১ খ্রিঃ খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলন,নেতৃত্ব দেন।
৫).১৯৩০ খ্রিঃ আইন অমান্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।
সর্বপরি,
৬).১৯৪২ সালে ইংরেজ সরকারের প্রতি সরাসরি ভারত ছাড়ো আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি তাঁর রাজনৈতিক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে নাথুরাম গডসের গুলির আঘাতে। যার সাথে চরমপন্থী হিন্দু মহাসভার যোগাযোগ ছিল। এই হত্যাকান্ডের মূল অভিযুক্ত গোডসে এবং তার সহায়তাকারী নারায়ণ আপতে-কে পরবর্তীতে আইনের আওতায় এনে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। ১৯৪৯ সালের ১৪ নভেম্বর তাদের ফাঁসি দেয়া হয়।

গান্ধীবাদ ও বাংলা কথা সাহিত্য

দেবযানী দে
অধ্যাপিকা
সাঁওতালদি কলেজ

বিশ শতকে ভারতীয় রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব ও মতাদর্শ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, গান্ধী এদেশে এক নতুন ভাবধারার প্রবর্তন করেন তা হচ্ছে অহিংস অসহযোগ অর্থাৎ অহিংসভাবে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে একক বা সংঘবদ্ধ আন্দোলন বা প্রতিরোধ। সমকালীন ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশে এই আন্দোলন সমগ্র স্বাধীনতা সংগ্রামের তুলনায় অনেক ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল সন্দেহ নেই। বাংলা কথা সাহিত্যে গান্ধীবাদ প্রথম যার রচনায় পাই তা হল তিনি হলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্যক্তিগত জীবনে গান্ধীজির আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী তিনি। 'ধাত্রীদেবতা', 'গণদেবতা' প্রভৃতি উপন্যাসে গান্ধীবাদ উপস্থিত।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মন্ত্রমুখর' উপন্যাস মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত। লেখক সেখানে নিপীড়িত জনগণের জাগরণ চিহ্নিত করেছেন। সমরেশ বসুর 'শ্রীমতী কাফে' উপন্যাসে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও গান্ধী দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঘোড়াই চরিত মানস', 'জাগরী', মহাশ্বেতা দেবীর 'চেট্টি মুন্ডা ও তার তীর', দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিবাহ বার্ষিকী' প্রভৃতি উপন্যাসগুলি গান্ধীবাদের ছায়াতে রচিত। এইভাবে কখনও গান্ধীবাদী ভাবধারা আবার কখনো গান্ধীবাদী আন্দোলন বাংলা কথা সাহিত্যে উর্বরতা বৃদ্ধি করেছে।

The dialogue between radical Bengali Marxist Ideology and Gandhism: Making the (im)possible possible

Sunita Mitra Sarkar
Assistant Professor
Department of Political science
Sabang Sajanikanta Mahavidyalaya

It may appear from the very title of the paper that it is going to be a futile exercise to establish any such ideological link between radical Bengali Marxism and Gandhism. Partly because of what we have witnessed in Bengal, somehow a strange stance for Gandhi in general and Gandhism in particular and partly because of our much valued ignorance of the literary works that had been put into this (im)possible bridge building exercise. During the nineteenth century the Bengali Bhadralok experienced a cultural renaissance that made them prominent among the professional classes and elite circles. But in 1930s situation changed and cleavages developed within the elites. Because of British policy of 'divide and rule', sudden rise of muslims in Bengal's politics and Gandhi's presence in national politics, the Bengali bhadralok felt marginalised and adopted Marxism as the possible panacea. Since Bengalis had had a long acquaintance with 'gupta samiti's and armed rebellions, the ideology of Marxism made an instant appeal to them.

This paper, however, tries to delineate the chronicles of a makeover which actually opened up the possibilities for a dialogue between two apparently impossible to bridge ideologies, namely Marxism-Leninism and Gandhism. It is through the writings of Pannalal Dasgupta, Gandhism and Marxism came closer and the question on possibilities of constructing a 'common' praxis had been dealt with.

অভিজিৎঃ গান্ধীর আলোকে

দেবশ্রী দে ঘোড়াই
অতিথি অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ
সবং সজনীকান্ত মহাবিদ্যালয়

গান্ধীজি অন্তরের শক্তিতেই বিশ্বাস করতেন। তাঁর দর্শনে আত্মশক্তির জাগরণ এবং তার যোগ্য মর্যাদা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। সে স্বায়ত্ত শাসনে হোক কিংবা ব্যক্তিক বিকাশে হোক। তাতে হিংসায় উন্মত্ত মানুষের মধ্য থেকেও এক সময় সুস্থ মানবিক সুরটি বনিত হবে। রবীন্দ্রনাথ চিরকালই মানুষের উপর বিশ্বাস রেখেছেন। তাঁর কবিতা, গল্প, গানে সেকথা বারে বারে বনিত হয়েছে। 'মুক্তধারা' নাটকে অভিজিৎ চরিত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীর দর্শনকে সুচারুভাবে প্রয়োগ করার চেষ্টা পেয়েছেন।

অভিজিৎ হল এই নাটকের মারনেওয়ালা মানুষের ভিতরকার জাগ্রত আত্মা। সমগ্র নাটকে উত্তর কূটের মানুষের হিংসা বৃত্তির মধ্য থেকে অভিজিৎ নামক সুস্থ মনের সুরটি পীড়িত শিবতরাইয়ের মাঠে নেমে এসেছে। ধনঞ্জয় বৈরাগী যেমন মারখানেওয়ালা মানুষের সুর, তেমনি শাসকেরও কোমল সুরটি অভিজিতের মধ্য দিয়ে একই সীমানায় মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। এখানে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির সেই বার্তাই নিয়ে এসেছেন, যেখানে শাসকের অন্তর আত্মা জাগ্রত হওয়া আবশ্যিক।

গান্ধীজির ধর্মবোধ তথা জীবনবোধ - একটি আলেখ্য

ড. অদিতি বেরা
অধ্যাপিকা
ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ

মহাত্মা গান্ধী আধ্যাত্মিক চেতনায় প্রগাঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। এই অধ্যাত্মবোধ তাকে জগৎমুখী ও মানবমুখী করে তুলেছে। তাঁর ধর্মবোধ জাগ্রত হয়ে উঠেছিল গভীর জীবনবোধের ভিতর দিয়ে। মধ্য বয়স থেকে তাঁর জীবনের প্রধান অবলম্বন ছিল গীতা। গান্ধীজির মা ছিলেন অতি নিষ্ঠাবান রমণী। গান্ধীজি তার মায়ের কাছ থেকে বাল্যকাল থেকেই ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি-প্রেমের শিক্ষাগ্রহণ করেন। গভীর মানবতা বোধের ভিতর দিয়েই এবং সহজাত নিষ্ঠার ভিতর দিয়েই গান্ধীজি ভগবানকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিলেন সত্যস্বরূপ ও প্রেম স্বরূপ করে।

কর্মযোগী গান্ধীজি তাঁর সকল কর্মের ভিতর দিয়ে মানুষের ভিতরকার অধ্যাত্ম সত্যকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। সর্বপ্রকার কর্মের মধ্য দিয়েই যে মানুষকে এই বোধের উদ্বুদ্ধ করে তোলা সম্ভব তা সমগ্র জীবন ধরে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। তাঁর ধর্ম জীবনের মূল কথা ছিল নিঃস্বার্থ সেবার ভিতর দিয়ে মহামানবের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। মানুষের সেবার মধ্য দিয়ে ভগবৎ সেবা, মহামানবের বিকাশের ভিতর দিয়ে মহাদেবতাকেই জাগ্রত ও তৃপ্ত করে তোলা। তাই তাঁর জীবনে তিনি সত্য স্বরূপ, প্রেম স্বরূপ, মঙ্গল স্বরূপ ঈশ্বরের দর্শন লাভে ধন্য হয়েছিলেন। ভারতের অনেক মহাপুরুষ, সাধক সাধিকা, সন্ত তাঁর জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। প্রেম স্বরূপ ভগবানে অধ্যাত্মচৈতন্যকে প্রতিষ্ঠিত রেখে নিঃশেষে আত্মত্যাগের ভিতর দিয়ে কর্মযোগে মহামানবের সেবাকে মুখ্য করে দেখেছেন তিনি তাঁর সমগ্র জীবন ধরে। তিনি যথার্থই মহাত্মা।

গ্রামোন্নয়ন ঃ গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ

ড. নির্মল বেরা
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সবং সজনীকান্ত মহাবিদ্যালয়

নবজাগ্রত ভারতের দুই মূর্তিমান পুরুষ ভারতাত্মা রবীন্দ্রনাথ ও জাতীর জনক মহাত্মা গান্ধীর গ্রামীণ ভারত ভাবনা আধুনিক ভারত গঠনে পাথের হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে শিলাইদহ ও পরে শ্রীনিকেতনে পল্লী উন্নয়ন চিন্তনের মাধ্যমে যে প্রায়োগিক ক্ষেত্র নির্মাণ করেছেন, তার সঙ্গে গান্ধীজির ওয়ার্ধায় পল্লী উন্নয়ন জনিত সাধনার দিকটির তুলনাত্মক দিকটি দেখানো যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহতেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষবাস, সমবায় গঠন, সান্ধ্য বিদ্যালয় স্থাপন, জাত-পাত দূরীকরণ, ব্যঙ্কিং ব্যবহার প্রচলন, স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রভৃতি বিষয়ে সময়োপযোগী যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন উনিশ শতকের শেষভাগে, তা তৎকালীন বাংলার সামাজিক প্রেক্ষিতে গ্রামোন্নয়নের বিপ্লব বলা যেতে পারে। উল্লিখিত কোন কোন ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে পথিকৃৎ ও বলা যেতে পারে।

কিছু পরে হলেও গান্ধীজি সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের সুবাদে সারা ভারতের সামাজিক দিকটি দেখেছিলেন গ্রাম্য-ভারতের চোখ দিয়ে। ফলে স্বায়ত্ব শাসন নির্ভর গ্রাম তৈরিতে তিনি গ্রাম স্বরাজের ওপর জোর দিলেন। গ্রামীণ বিচার ব্যবস্থা, গ্রামীণ স্বনির্ভরতা, ব্যক্তিক জীবনে নঈতালিম, সর্বোপরি অহিংস সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে আধুনিক বিভেদহীন গ্রাম দেখতে চেয়েছেন মহাত্মাজী। এখানে দু-জনের মধ্যেই মূলগত সাদৃশ্যটি হল স্বনির্ভরতার মাধ্যমে ব্যক্তিক বিকাশ সাধন সুচারুভাবে রক্ষা করা। এসবের ভিতর থেকে গ্রাম-ভারতের বিকাশটি সহজতর হবে। রবীন্দ্রনাথের পল্লী উন্নয়ন ও গান্ধীজির গ্রাম স্বরাজ আসলে উদ্দেশ্যগতভাবে একই। উভয়েই এর মাধ্যমে আধুনিক ভারতের স্বপ্ন দেখেছেন।

গান্ধীজি ও তাঁর অহিংস আদর্শ

ড. সচ্চিদানন্দ দাস

ভারত তথা সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে রাষ্ট্রচিন্তার তথা জীবন সাধনার একজন অভিনব পথ প্রদর্শক হলেন মহাত্মা গান্ধী। অহিংস দর্শনকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে তাঁর চিন্তা-চেতনার জগৎ। সংস্কৃত 'অহিংস' শব্দটি বহু পুরাতন হলেও গান্ধীজি প্রয়োগ কৌশলে তার নব জন্ম ঘটিয়েছেন। শব্দটিকে তিনি 'No Injuri' বা 'Non Killing' অর্থে গ্রহণ করেননি, করেছেন 'Non Violence' অর্থে। অহিংসাকে তিনি সব ধর্মের প্রাণ হিসাবে বিবেচনা করেছেন – ''Non Vilonce on Ahinsa is the heart of all religions.'' সত্য এবং অহিংসা তাঁর কাছে একটি গোলাকার চাকতির দু'দিক। একদিককে অপর দিক থেকে আলাদা করা যায় না। সত্য অবিনশ্বর, অক্ষয়। যার উপর দাঁড়িয়ে আছে অহিংসা। অশুভ শক্তির সঙ্গে লড়াইয়ের ময়দানে এই নীতির ব্যবহার গান্ধীজি একেবারে নিজস্ব উদ্ভাবন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি অহিংসাকে উৎকৃষ্ট শক্তি হিসাবে দেখেছেন।

গান্ধীজি অহিংসার সঙ্গে সত্যকে, সত্যের সঙ্গে প্রেমকে এবং প্রেমের সঙ্গে ঈশ্বরকে একাত্ম করে দেখেছেন। বলেছেন 'Truth is god' কৈশোরে নাস্তিক্যের প্রান্ত ছুঁয়ে পরবর্তীকালে তাঁর মধ্যে যে আধ্যাত্মিক আকুলতা দেখা যায় তা কিন্তু যোগীর আকুলতা নয়। তবে ঈশ্বরে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। আত্মজীবনীতে লিখেছেন-

''তাঁকে আমি দেখিনি, তাঁকে আমি জানি না; তাঁর প্রতি বিশ্বের যে বিশ্বাস,
সেই বিশ্বাসকে আমি আপন করে নিয়েছি।''

ঈশ্বরকে তিনি ব্যক্তিরূপে ভাবেননি। গান্ধীর কাছে ঈশ্বর হল ঈশ্বরের নিয়মের অন্বেষণ। ঈশ্বরের নিয়ম মানেই প্রেমের নিয়ম। প্রেম ও সত্যের মাঝে কোন বিভাজন নেই। সত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েই প্রেম লাভ করে পরম মহত্ত্ব। সত্য থেকে যে প্রেম বিচ্ছিন্ন তাতে বিশুদ্ধতা নেই, প্রেমের মূল কথা বিদ্বেষহীনতা। বিদ্বেষহীনতাই গান্ধীজির ভাবনায় অহিংসা। যা বিশুদ্ধ প্রেম তা-ই 'সত্য, তাই ঈশ্বর। ঈশ্বরের নিয়মকে তিনি জানতে চেয়েছেন অনুশীলনের মাধ্যমে। অহিংসা, প্রেম-কে তিনি কখনো দার্শনিক সমস্যার সমাধানে ব্যবহার করেননি, ব্যবহার করেছেন কর্মে। গান্ধী জোর দিয়েছেন কর্মের উপর। তিনি জ্ঞানবাদী নন কর্মযোগী। নিজে মুক্তি চাননি, মানুষকে মুক্ত করতে চেয়েছেন। মানুষের আত্মার শক্তিকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন। অন্তরের শক্তি ও সংকল্পকে নিয়োগ করেছেন গঠনমূলক কাজে ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে।

গান্ধীজির সত্যাগ্রহ সত্যকে আশ্রয় করে অন্যায়ের সঙ্গে অসহযোগ। অহিংস হল অন্যায়কারীর প্রতিও হিংসা না করা। তিনি ক্রোধকে অক্রোধের দ্বারা করতে বলেছেন। হিংসাকে হিংসা দিয়ে জয়ের চেষ্টায় তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁর আদর্শের বাস্তবায়ন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম। তাঁর জীবনই তাঁর বাণী। অন্নদাশঙ্কর বিশ্বকবি সম্পর্কে বলেছেন 'জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ' আর গান্ধীজি তাঁর জীবনীমূলক রচনার নাম রেখেছেন —The Story of My Experiments with Truth.' আনবিক বোমা যখন বংসের মুখে ইতিহাসের ভয়ঙ্কর রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত তখন গান্ধীজি মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন অহিংসার মৃত্যুঞ্জয়ী আশার বাণী। মানুষের বিশ্বাস ভয়াবহ সংকটকালে তিনি ঈশ্বর প্রেরিত মানব সভ্যতা রক্ষার দূত।

গান্ধী স্মরণে রবীন্দ্র-কবিতা

ড. রাজেশ কুমার দত্ত

সবং সজনীকান্ত মহাবিদ্যালয়

মহাত্মা গান্ধী কেবল একটা নাম নয়, একটা যুগ। পরাধীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। তাঁর নীতি, আদর্শ ও দর্শন সকল স্তরের মানুষকেই প্রভাবিত করেছিল। বহু কবি-সাহিত্যিক সেই ভাবধারায় হয়েছিলেন আপ্লুত। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের একজন অন্যতম। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমস্ত শাখাতেই গান্ধী প্রভাব গভীর। কবি 'মহাত্মা গান্ধী' প্রবন্ধে বলেছেন—

> ''মহাত্মা যদি বীরপুরুষ হতেন কিংবা লড়াই করতেন তবে আমরা এমনি করে আজ ওঁকে স্মরণ করতুম না। ... কিন্তু এই-যে একটা অনুশাসন, মরব তবু মারব না, এবং এই করেই জয়ী হব— এ একটা মস্ত বড়ো কথা, একটা বাণী। ...অধর্ম-যুদ্ধে মরাটা মরা। ধর্মযুদ্ধে মরার পরেও অবশিষ্ট থাকে; হার পেরিয়ে থাকে জিত, মৃত্যু পেরিয়ে অমৃত। যিনি এই কথাটা নিজের জীবনে উপলব্ধি করে স্বীকার করেছেন, তাঁর কথা শুনতে আমরা বাধ্য।''

এই জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত কবি তাঁর কবিতায় স্মরণ করেছেন গান্ধীজিকে। 'পরিশেষ' কাব্যের 'অগ্রদূত', 'শান্ত' ও 'প্রণাম' কবিতা ত্রয় তার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। 'অগ্রদূত' কবিতার প্রথমেই গান্ধীজির উদ্দেশে কবি জানিয়েছেন—

> ''হে পথিক, তুমি একা।
> আপনার মনে জানি না কেমনে
> অদেখার পেলে দেখা।''

ঔপনিষদিক মতে আত্মাই ব্রহ্ম। মানুষ তাঁর সাক্ষাৎ সহজে পায় না। প্রকৃত আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে মানুষ ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা মুক্ত হয়ে যখন পরার্থে আত্মত্যাগের সংকল্প করে, তখনই সেই অদেখার সন্ধান পায়। গান্ধীজি নিজের জীবনকে দেশের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন বলেই পেয়েছিলেন আত্ম ব্রহ্মের সাক্ষাৎ। সেই সাক্ষাৎ, উপলব্ধি মানুষকে মৃত্যুঞ্জয়ী করে তোলে। সে কারণেই 'নবজীবনের সংকটপথে' অগ্রগামী পথিক গান্ধীজি মানুষকে শুনাতে পেরেছেন '''মহাবাণী'— 'আছে আছে''' (অগ্রদূত)। গান্ধীজির ধীর, স্থির, শান্ত মহিমার কথা তুলে ধরা হয়েছে 'শান্ত' কবিতায়। 'প্রণাম' কবিতাতেও রয়েছে গান্ধীজির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। গান্ধীজির 'শুভ্র আলোকে' মানুষ হয়ে ওঠে শুচি-শুভ্র।

মহাত্মা গান্ধী ও বাঙালী ঃ অভিনব পারস্পরিক

ড . অনন্যা ঘোষ
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, বাংলা বিভাগ
সবং সজনীকান্ত মহাবিদ্যালয়

মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে বাংলা ও বাঙালীর পারস্পরিক সম্পর্কটি যথেষ্ট অভিনব। এই সম্পর্কের মূল্যায়ণ আমরা সুস্পষ্টভাবে কয়েকটি পর্যায়ে করতে পারি।পর্যায়গুলি মোটামুটিভাবে, উভয় পক্ষের মানস প্রকৃতিকে বহুলাংশে তুলে ধরবে।

বাংলা ও বাঙালী সম্পর্কে মহাত্মাজীর ভাবনাক্রমের একটি আকরগ্রন্থ অবশ্যই তাঁর আত্মজীবনীটি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে তাঁর আত্মজীবনীর বাংলা অনুবাদ, – 'সত্যের প্রয়োগ অথবা আত্মকথা' নবজীবন ট্রাস্ট থেকে মহাত্মাগান্ধীর শতবর্ষে প্রকাশিত হয়। এই আত্মজীবনীতেই আমরা জানতে পারি মহাত্মা গান্ধী প্রথম যখন কলকাতায় এসেছিলেন তখন তিনি 'মহাত্মা' হয়ে উঠেননি। তাঁর সেবারের কলকাতা যাত্রায় তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু স্বামীজীর অসুস্থতার জন্য তা সম্ভব হয়নি। তার এই আত্মকথায় আমরা জানতে পারি, তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সাধাসিধে জীবনযাপনের প্রতি কতটা আকৃষ্ট ছিলেন।

মহাত্মাগান্ধীর আত্মজীবনীতে বেশ কয়েকবার এসেছে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ, এসেছে তাঁর শান্তিনিকেতন ভ্রমণের কথা। বাংলায় স্বদেশীযুগে যখন বিদেশী দ্রব্য বর্জনের জোয়ার এসেছিল তখন গুয়াহাটি ব্যবসায়ীদের একাংশ সুযোগ বুঝে দেশী পণ্যের দাম বাড়িয়ে দিয়েছিল। এই ঘটনায় গান্ধীজির সমস্ত সমমর্মিতা ব্যক্ত হয়েছে, আবেগপ্রবণ বাঙালীর প্রতি। আবার বাঙালী সমাজের শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতি অনুরক্ত হয়েও তিনি ব্যয়িত হয়েছেন কালীঘাটের মন্দিরে পশুগুলির রক্তাক্ত বিভৎসতা দেখে।

গান্ধীজির জীবনে বিশেষ কয়েকটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের অসামান্য ভূমিকা ছিল। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে', 'জীবন যখন শুকায়ে যায় কয়না ধারায় এস' এই গানগুলির কথা এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে। শেষোক্ত গানটি স্বয়ং কবির কণ্ঠে তিনি একাধিকবার শুনতে চেয়েছেন।

দেশ যখন স্বাধীনতা পেল, তখন রাজধানীতে উৎসবের জোয়ার, নেহেরুজীর মধ্যরাতের বিখ্যাত বক্তৃতায় নিয়তির সঙ্গে অভিসারের কথা যখন উচ্চারিত হচ্ছে। তখন 'নগ্ন ফকির' মহাত্মাগান্ধী দাঙ্গা বি বস্ত বাংলায় শান্তি ফিরানোর কাজে ব্যস্ত। কলকাতায় তিনি দাঁড়িয়েছেন আক্রান্ত মুসলমানের পাশে, আবার নোয়াশুলিতে তার অবস্থান আক্রান্ত হিন্দুদের পাশে। কারণ, তিনি তো মানবতার শেষ প্রহরী।

বাঙালীর চোখে মহাত্মা গান্ধীর মূল্যায়ণের দিকটিকেও এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বহুবিষয়ে মত পার্থক্য থাকলেও মহাত্মা গান্ধীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা ছিল অটুট।

রবীন্দ্রনাথের ধনঞ্জয় বৈরাগী বহুলাংশে মহাত্মাগান্ধীর আদর্শে গড়া। আবার একথাও ভুলবার নয় যে, মহাত্মা গান্ধীকে 'জাতির জনক' হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন এক বাঙালী, সুভাষচন্দ্র বসু। বাংলায় আমরা পেয়েছি তারাশঙ্কর ও সতীনাথ ভাদুড়ীর মনে গান্ধীবাদী সাহিত্যিক, অমলেশ ত্রিপাঠীর মত ঐতিহাসিক কিংবা অম্লান দত্তের মত অর্থনীতিবিদ্।

বিগত কয়েক দশকে বাঙালীদের মধ্যে গান্ধীচর্চায় যে ভাটা পড়েছে তা-ই নয়, বহুক্ষেত্রে গান্ধীজির অবমূল্যায়ণের একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, এক প্রগাঢ় অশিক্ষার ফল এই প্রবণতা। একমাত্র বিশুদ্ধ জ্ঞান ও শিক্ষা দিয়েই এই প্রবণতাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব। যে মানুষটি ভারতবর্ষের রাজনীতিকে প্রথম যথার্থে গণমুখী করেছিলেন, যে মানুষ আমাদের পরম যত্নে শিখিয়েছিলেন স্বচ্ছতার পাঠ, যে মানুষের কল্পনাই ফলপ্রসূ হয়েছে ভারতবর্ষে ভাষা ভিত্তিক রাজ্যগঠনের মধ্য দিয়ে, যিনি আধুনিক বিশ্বকে দিয়েছেন অহিংসা ও সত্যাগ্রহের বাণী; আজকের বাঙালী সমাজ যদি তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তা হবে ইতিহাসের তুলনা রহিত ট্র্যাজেডি।

Mohandas Karamchand Gandhi and his vision for women empowerment

Dr. Biswanath Sarkar,
Assistant Professor,
Department of Political Science,
Sree Chaitanya College, Habra

Today the empowerment of women has become one of the most important concerns of 21st century. But practically women empowerment is still an illusion of reality in India. Women's empowerment is the process in which women elaborate and recreate what it is that they can be, do, and accomplish in a circumstance that they previously were denied. Empowerment can be defined in many ways, however, when talking about women's empowerment, empowerment means accepting and allowing people (women) who are on the outside of the decision-making process into it. This puts a strong emphasis on participation in political structures and formal decision-making and, in the economic sphere, on the ability to obtain an income that enables participation in economic decision-making. Empowerment is the process that creates power in individuals over their own lives, society, and in their communities.

The position of women in India has diverse in different periods and in different classes, religions, and ethnic groups. The pre and post-independence era has witnessed the exploitation of women in outside and inside their home. In this paper we will try to discuss on Gandhiji's thought on women uplift, against child marriage, social and religious barriers to widow remarriage, purdha system, dowry system, heavy expenditure in connection to marriage, etc. in the context of West Bengal.

…….

গান্ধী স্মরণে রবীন্দ্র-কবিতা

ড. রাজেশ কুমার দত্ত

সবং সজনীকান্ত মহাবিদ্যালয়

মহাত্মা গান্ধী কেবল একটা নাম নয়, একটা যুগ। পরাধীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। তাঁর নীতি, আদর্শ ও দর্শন সকল স্তরের মানুষকেই প্রভাবিত করেছিল। বহু কবি-সাহিত্যিক সেই ভাবধারায় হয়েছিলেন আপ্লুত। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের একজন অন্যতম। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমস্ত শাখাতেই গান্ধী প্রভাব গভীর। কবি 'মহাত্মা গান্ধী' প্রবন্ধে বলেছেন—

> ''মহাত্মা যদি বীরপুরুষ হতেন কিংবা লড়াই করতেন তবে আমরা এমনি করে আজ ওঁকে স্মরণ করতুম না। ... কিন্তু এই-যে একটা অনুশাসন, মরব তবু মারব না, এবং এই করেই জয়ী হব— এ একটা মস্ত বড়ো কথা, একটা বাণী। ...অধর্ম-যুদ্ধে মরাটা মরা। ধর্মযুদ্ধে মরার পরেও অবশিষ্ট থাকে; হার পেরিয়ে থাকে জিত, মৃত্যু পেরিয়ে অমৃত। যিনি এই কথাটা নিজের জীবনে উপলব্ধি করে স্বীকার করেছেন, তাঁর কথা শুনতে আমরা বাধ্য।''

এই জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত কবি তাঁর কবিতায় স্মরণ করেছেন গান্ধীজিকে। 'পরিশেষ' কাব্যের 'অগ্রদূত', 'শান্ত' ও 'প্রণাম' কবিতা ত্রয় তার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। 'অগ্রদূত' কবিতার প্রথমেই গান্ধীজির উদ্দেশে কবি জানিয়েছেন—

> ''হে পথিক, তুমি একা।
> আপনার মনে জানি না কেমনে
> অদেখার পেলে দেখা।''

ঔপনিষদিক মতে আত্মাই ব্রহ্ম। মানুষ তাঁর সাক্ষাৎ সহজে পায় না। প্রকৃত আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে মানুষ ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা মুক্ত হয়ে যখন পরার্থে আত্মত্যাগের সংকল্প করে, তখনই সেই অদেখার সন্ধান পায়। গান্ধীজি নিজের জীবনকে দেশের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন বলেই পেয়েছিলেন আত্ম ব্রহ্মের সাক্ষাৎ। সেই সাক্ষাৎ, উপলব্ধি মানুষকে মৃত্যুঞ্জয়ী করে তোলে। সে কারণেই 'নবজীবনের সংকটপথে' অগ্রগামী পথিক গান্ধীজি মানুষকে শুনাতে পেরেছেন '''মহাবাণী'— 'আছে আছে''' (অগ্রদূত)। গান্ধীজির ধীর, স্থির, শান্ত মহিমার কথা তুলে ধরা হয়েছে 'শান্ত' কবিতায়। 'প্রণাম' কবিতাতেও রয়েছে গান্ধীজির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। গান্ধীজির 'শুভ্র আলোকে' মানুষ হয়ে ওঠে শুচি-শুভ্র।